আছহাবে রাসূলের জীবনধারা

এ কে এম নাজির আহমদ

আছহাবে রাসূলের জীবনধারা

এ কে এম নাজির আহমদ

আহসান পাবলিকেশন

বাংলাবাজার ■ মগবাজার ■ কাঁটাবন

আছহাবে রাসূলের জীবনধারা

এ কে এম নাজির আহমদ

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহসান পাবলিকেশন
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০

ISBN : 984-32-2796-4

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৫
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫
ফাল্গুন ১৪২১
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৬

প্রচ্ছদ : গোলাম মাওলা

কম্পোজ : আহসান কম্পিউটার
কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২২১৯৫

মুদ্রণে
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ একশত দশ টাকা মাত্র

ASHABE RASULER JIBANDHARA Written by A K M NAZIR AHMAD Published by Muhammad Golam Kibria, Ahsan Publication, Book & Computer Complex 38/3 Banglabazar, Dhaka-1100 First Edition November 2005, 2nd Edition February 2015 Price Tk. 110.00 only. ($ 3.00)

AP-37

ভূমিকা

'ছুহবাত' শব্দের অর্থ সাহচর্য।
'ছাহাবী' শব্দটি 'ছুহবাত' শব্দ থেকে উৎসারিত।
'আছহাব' শব্দটি 'ছাহাবী' শব্দের বহুবচন।

'ছাহাবী' বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কম হোক বেশি হোক তাঁর 'ছুহবাত' বা সাহচর্য লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর অটল অবিচল থেকেই ইন্তিকাল করেছেন।

আছহাবে রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র 'ছুহবাত' লাভ করে অনন্য সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছিলেন।
পরবর্তী কালের যেই কোন উঁচু মাপের নেক ব্যক্তির তুলনায় তাঁদের মর্যাদা অনেক উর্ধে। অবশ্য মর্যাদার দিক থেকে আছহাবে রাসূলের নিজেদের মধ্যে তারতম্য ছিলো।

ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) উম্মাতের মধ্যে সার্বিক বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা), আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিকের (রা) পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি উসমান ইবনু আফফান (রা) এবং উসমান ইবনু আফফানের (রা) পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আলী ইবনু আবী তালিব (রা)।

এক একজন ছাহাবী ছিলেন এক একটি ইনস্টিটিউশন।
তাঁরা ছিলেন বহুবিধ গুণের আধার।

আল কুরআনের সাথে সম্পৃক্তি এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (রা) সাহচর্য তাঁদেরকে আলোর মিনারে পরিণত করেছিলো।

এই বইটিতে আমি নমুনা হিসেবে কয়েকজন ছাহাবীর ঈমানী দৃঢ়তা, দা'ওয়াতী তৎপরতা, আল কুরআন চর্চা, আত্মত্যাগ, অল্পে তুষ্টি, রাত্রি জাগরণ এবং বীরত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেছি।
আশা করি বইটি প্রিয় পাঠক পাঠিকাদেরকে আছহাবে রাসূলের কয়েকটি বৈশিষ্ট সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে সক্ষম হবে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

আছহাবে
রাসূলের
ঈমানী
দৃঢ়তা

উসমান ইবনু আফফানের (রা) ঈমানী দৃঢ়তা

উসমান ইবনু আফফান (রা) ছিলেন মাক্কার বানু উমাইয়ার সন্তান।

তিনি ছিলেন খুবই সুদর্শন।
লজ্জাশীলতা ছিলো তাঁর অন্যতম প্রধান ভূষণ।

যৌবনে পৌঁছে তিনি কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন।
তিনি ছিলেন আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিকের (রা) ব্যবসায়ী বন্ধুদের একজন।

আবু বাকর আছ ছিদ্দিকের (রা) আহ্বানে সাড়া দিয়ে উসমান ইবনু আফফান (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।
বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়।
উসমান ইবনু আফফানের (রা) চাচা আল হাকাম ইবনু আবিল 'আস ছিলো নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ।
আল হাকাম তাঁকে রশি দিয়ে শক্তভাবে বাঁধে।
একটি কোড়া দিয়ে তাঁকে পিটাতে থাকে।
আল হাকাম বলতে থাকে, "নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তুমি আমাদের বাপ-দাদার মুখে কালি দিয়েছো। এই ধর্ম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়া হবে না।"

উসমান ইবনু আফফানকে (রা) ঘরের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হতো।
কখনো কখনো কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁকে কিছু খেতে ও পান করতে দেয়া হতো না।
ক্ষুধা ও পিপাসায় তিনি দারুণ কষ্ট পেতেন।
আল হাকাম বারবার তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য বলতো।
কিন্তু ক্ষুধা, পিপাসা ও পিটুনিজনিত ব্যথা তাঁর ঈমানে চিড় ধরাতে পারতো না।
উসমান (রা) বলতেন, "আপনাদের যা ইচ্ছা তা-ই করুন। এই দীন আমি কখনো ত্যাগ করবো না।"

মাক্কায় তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।
তিনি হিজরাতের সিদ্ধান্ত নেন।
নবুওয়াতের পঞ্চম সনে উসমান ইবনু আফফান (রা) তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াকে (রা) নিয়ে অতি গোপনে হাবশায় হিজরাত করেন।
পেছনে রেখে যান সুন্দর বাড়ি।
বাণিজ্য সম্ভার।
তবে হাতছাড়া হতে দেননি ঈমানের ঐশ্বর্য।

তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহর (রা) ঈমানী দৃঢ়তা

আবু মুহাম্মাদ তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা) ছিলেন মাক্কার বানু তাইমের সন্তান।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের পূর্বেই তাঁর আব্বা উবাইদুল্লাহর ইন্তিকাল হয়।
তাঁর আম্মার নাম ছিলো সা'বা বিনতু আবদিল্লাহ আলহাদরামী।
প্রখ্যাত ছাহাবী আ'লা ইবনু আবদিল্লাহ আলহাদরামী (রা) ছিলেন সা'বার ভাই।

তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা) ছিলেন আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিকের (রা) অন্যতম ব্যবসায়ী বন্ধু।
আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিকের (রা) প্রভাবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
তাঁর আম্মা ছিলো শিরকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত একজন মহিলা।
সে যখন জানতে পেলো তার ছেলে ইসলাম গ্রহণ করেছে, সে দারুণ হৈ চৈ শুরু করলো।
তাঁর গোত্রের লোকেরা এগিয়ে আসে।
সব ঘটনা শুনে তারা তালহাকে (রা) ইসলাম ত্যাগ করতে বলে।
তিনি অস্বীকৃতি জানান।
এতে তারা রেগে যায়।

নাওফিল ইবনু খুয়াইলিদ নামক এক ব্যক্তি একই রশি দিয়ে আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) এবং তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহকে (রা) শক্তভাবে বেঁধে পিটিয়ে পিটিয়ে মনের ঝাল মেটায়।

বিভিন্ন সময় তালহা (রা) তাদের হাতে মার খেয়েছেন।
তাঁর শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।
কিন্তু তিনি তাঁর ঈমানে সামান্য আঁচড়ও লাগতে দেননি।

[উল্লেখ্য যে পরবর্তীকালে তালহার (রা) আম্মা ইসলাম গ্রহণ করে একজন ছাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।]

সুমাইয়া বিন্‌তু খুব্‌বাতের (রা) ঈমানী দৃঢ়তা

সুমাইয়া বিন্‌তু খুব্‌বাত (রা) আবু হুজাইফা ইবনুল মুগীরা আল মাখযুমীর দাসী ছিলেন।

ইয়াসির (রা) ছিলেন ইয়ামানের অধিবাসী।

একবার তিনি মাক্কায় এসে এখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বাইরের কেউ মাক্কায় স্থায়ীভাবে থাকতে হলে তাকে মাক্কার কোন না কোন গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হতো।

ইয়াসির (রা) আবু হুজাইফা ইবনুল মুগীরার সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং মাক্কাতে বসবাস করতে থাকেন।

আবু হুজাইফা তার দাসী সুমাইয়াকে (রা) ইয়াসিরের (রা) সাথে বিয়ে দেন।

সুখেই কাটছিলো তাঁদের দিনগুলো।

ইতিমধ্যে মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন।

গোপনে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন।

ইয়াসির (রা) ও সুমাইয়া (রা) ইসলামের কথা অবগত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

এক সময়ে তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

আবু জাহল ও তার সংগীরা তাঁদেরকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য চাপ দিতে থাকে।

তাঁরা তাঁদের ঈমানের ওপর অটল থাকেন।

অতপর তাঁদেরকে দিনের বেলা লোহার পোষাক পরিয়ে রোদে দাঁড় করিয়ে রেখে শাস্তি দেয়া শুরু হয়।

খুবই যন্ত্রণাদায়ক ছিলো এই শাস্তি।

প্রচণ্ড উত্তাপে তাঁদের শরীর দুমড়ে যেতে থাকে।

কিন্তু তাঁদের ঈমানে ধরেনি এতোটুকু চিড়।

একদিন আবু জাহল ইয়াসিরকে (রা) ধরে বেদম পিটুনি দেয়। আর বলতে থাকে ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিতে। আল্লাহর প্রেমিক ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিলেন না।

অনবরত চলতে থাকে পিটুনি।

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে যায় তাঁর শরীর।

এক পর্যায়ে এসে তিনি শহীদ হয়ে যান।

ইয়াসিরের (রা) স্ত্রী সুমাইয়াকেও (রা) সারাদিন রোদে দাঁড় করিয়ে রেখে শাস্তি দেয়া হতো।

সন্ধ্যায় তাঁকে ছেড়ে দেয়া হতো।

একদিন শাস্তি ভোগ করে ক্লান্তদেহে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন।

আবু জাহল তাঁকে দেখে গালমন্দ করতে থাকে।

ইসলাম ত্যাগ করতে বলে।

সুমাইয়া (রা) তার কথায় কান দিলেন না।

ভীষণ ক্ষেপে যায় আবু জাহল।

তার হাতে ছিলো বল্লম।

সে বল্লমটি ছুড়ে দেয় সুমাইয়াকে (রা) লক্ষ্য করে।

বল্লমটি তাঁর লজ্জাস্থান ভেদ করে পেছনের দিকে চলে যায়।

প্রবল বেগে ঝরতে থাকে রক্ত।

এই কঠিন অবস্থাতেও তিনি আঁকড়ে থাকেন ঈমানের ঐশ্বর্য।

সুমাইয়া বিন্‌তু খুব্বাত (রা) শহীদ হন।

আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করে পৌঁছে যান জান্নাতের ঠিকানায়।

লুবাইনার (রা) ঈমানী দৃঢ়তা

লুবাইনা (রা) ছিলেন উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) দাসী।
ইসলামের মর্মকথা অবগত হয়ে তিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন।
আল্লাহর প্রতি ঈমান তাঁর মাঝে সৃষ্টি করে অসাধারণ দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা।

উমার (রা) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। বরং ইসলামের বিরুদ্ধে তার মনে ছিলো দারুণ আক্রোশ।
কিছু দিনের মধ্যেই উমার (রা) বুঝতে পারেন যে লুবাইনা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন।
উমার (রা) তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করতে বলেন।
লুবাইনা (রা) তাঁর কথায় কান দিলেন না।
এতে উমার (রা) ক্ষেপে যান।
একটি চাবুক নিয়ে লুবাইনাকে (রা) পিটাতে শুরু করেন।
বারবার বলা সত্ত্বেও লুবাইনা (রা) ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিলেন না।
উমার (রা) ছিলেন অত্যন্ত বলবান পুরুষ।
সেই বলবান পুরুষও লুবাইনাকে (রা) পিটাতে পিটাতে ক্লান্ত হয়ে বসে গিয়ে বলেন, "তোকে পিটাবার মতো শক্তি আর আমার গায়ে নেই।"
ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে ঈমানের বলে বলীয়ান লুবাইনা (রা) দৃঢ়তার সাথে বলেন, "আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন আল্লাহ আপনার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেবেন।"

দিনের পর দিন লুবাইনা (রা) এইভাবে মার খেতে থাকেন।
নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেন।
কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করেননি।

উম্মু শুরাইকের (রা) ঈমানী দৃঢ়তা

উম্মু শুরাইক (রা)।
মাক্কার এক মহিলা।
ইসলামের কথা পৌঁছলো তাঁর কানে।
তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
অতপর নেমে পড়েন দাওয়াতী কাজে।
তিনি বিভিন্ন বাড়িতে যেতেন।
আলাপ করতেন বাড়ির মহিলাদের সাথে।
সুযোগ বুঝে ইসলামের মর্মকথা তুলে ধরতেন তাদের কাছে।

এক সময় বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়।
মুশরিক নেতারা তাঁকে গ্রেফতার করে।
তুলে দেয় তাঁর গোত্রের লোকদের হাতে।
তাঁকে শাস্তি দিতে বলে।
তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়।
তাঁকে শুকনো রুটি ও মধু খেতে বাধ্য করে।
অতপর তাঁকে প্রচণ্ড রোদে গরম বালুর ওপর শুইয়ে দেয়।
প্রচণ্ড রোদ আর গরম বালুর উত্তাপে তিনি ছটফট করতে থাকেন।
পিপাসায় কাঁতরাতে থাকেন।
একটু পানি দেবার জন্য লোকদেরকে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন।
কেউ সাড়া দিলো না তাঁর অনুরোধে।
কেউ দিলো না তাঁকে একটু পানি।

এইভাবে কেটে যায় তিনটি দিন।
প্রচণ্ড উত্তাপ ও পিপাসায় তিনি মুমূর্ষ হয়ে পড়েন।

এক পর্যায়ে এসে তিনি বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

যালিমরা তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করতে বলতো।

কিন্তু বোধশক্তি হারিয়ে ফেলায় তিনি তাদের কথা বুঝে ওঠতে পারতেন না।

তৃতীয় দিন একব্যক্তি আসমানের দিকে ইশারা করে তাঁকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান ত্যাগ করতে বলে।

অংগভংগির মাধ্যমে সে যা বুঝাতে চেয়েছিল তিনি তা বুঝতে সক্ষম হন।

চিৎকার দিয়ে তিনি বলে ওঠেন, "আল্লাহর কসম, আমি তো এখনো সেই ঈমানের ওপরই অটল আছি।"

[আল্লাহর প্রতি তাঁর নিখাদ ঈমান দেখে তাঁর গোত্রের লোকেরা খুবই প্রভাবিত হয়।

তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়।

এক সময় তাঁর পদাংক অনুসরণ করে তাঁর গোত্রের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে।]

বিলাল ইবনু রাবাহর (রা) ঈমানী দৃঢ়তা

বিলাল ইবনু রাবাহ (রা) ছিলেন হাবশার (ইথিওপিয়ার) কালো মানুষদের বংশধর।

তিনি ছিলেন মাক্কার অন্যতম সরদার উমাইয়া ইবনু খালাফের ক্রীতদাস।

তাঁর গায়ের রঙ ছিলো মিশমিশে কালো।

অন্তরটি ছিলো ভারী সুন্দর।

খৃস্টীয় ৬১০ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন।

তিনি নীরবে লোকদের কাছে তুলে ধরছিলেন ইসলামের মর্মকথা।

সাহসী সত্য-সন্ধানী মানুষেরা একে একে গ্রহণ করছিলেন রাসূলের (সা) প্রচারিত দীন।

একদিন বিলালও পেলেন সত্যের সন্ধান।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাত করে, আল কুরআনের বাণী শুনে এবং এক অদ্বিতীয় আল্লাহর পরিচয় লাভ করে তিনিও ভীড়ে গেলেন সেই কাফিলায়।

উমাইয়া ইবনু খালাফ ছিলো নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ।

সে ছিলো ইসলামের চরম বিদ্বেষীদের একজন।

বিলাল (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন শুনে সে ভীষণ ক্ষেপে যায়।

তাঁর ওপর চালাতে থাকে নির্যাতন।

নানাভাবে তাঁকে কষ্ট দেয়া হতো।

রাতে তাঁকে খুঁটির সাথে বেঁধে চাবুক মারা হতো।

চাবুকের আঘাতে তাঁর শরীর জর্জরিত হয়ে যেতো।

রক্ত গড়িয়ে পড়তো শরীর থেকে।

যন্ত্রণায় তিনি কঁকাতে থাকতেন।

তাঁর যন্ত্রণা দেখে তৃপ্তি বোধ করতো পাষণ্ড উমাইয়া।

দিনের বেলা গলায় রশি বেঁধে তাঁকে বখাটে ছেলেদের হাতে তুলে দেয়া হতো।

তারা তাঁকে মাক্কার পথে পথে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে উল্লাস করতো।

দুপুরের দিকে লোহার পোষাক পরিয়ে তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো।

রোদে তেতে যেতো লোহার পোষাক।

উত্তাপে অস্থির হয়ে পড়তেন বিলাল (রা)।

উমাইয়া কাছে এসে ইসলাম ত্যাগের জন্য চাপ দিতো।

জওয়াবে তিনি শুধু বলতেন, "আহাদ, আহাদ।"

একদিন আবু জাহলের নির্দেশে তাঁকে উদোম করে গরম বালু আর কংকরের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দেয়া হয়।

অতপর তাঁর পিঠে চাপিয়ে দেয়া হয় এক খণ্ড ভারী পাথর।

পাথরের চাপে তিনি বুকে দারুণ ব্যথা অনুভব করছিলেন।

অনেক কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে থাকেন।

আবু জাহল কাছে এসে বলে, "বাঁচতে যদি চাস মুহাম্মাদের আল্লাহকে ত্যাগ কর।"

এই কঠিন পরিস্থিতির শিকার হয়েও ঈমানের বলে বলীয়ান বিলাল (রা) ক্ষীণকণ্ঠে দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করেন, "আহাদ, আহাদ।"

দিনের পর দিন তিনি নানা ধরনের নির্যাতন ভোগ করেছেন।

কিন্তু তাঁর নিখাদ ঈমানে এতোটুকু খাদ মিশ্রিত হতে দেননি।

আবু ফাকীহা ইয়াসার ইযদির (রা) ঈমানী দৃঢ়তা

আবু ফাকীহা ইয়াসার ইযদি (রা) ছিলেন উমাইয়া ইবনু খালাফের অন্যতম ক্রীতদাস।
ইসলামের প্রথম পর্বেই তাঁর কাছে পৌঁছে ইসলামের আহ্বান।
তিনি ইতিবাচক সাড়া দেন।
ইসলামের আলোকে আলোকিত হন।
দাস জীবনের গ্লানির কথা ভুলে যান।
বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখেন।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা জানাজানি হয়ে যায়।
উমাইয়া ইবনু খালাফ তাঁর ওপর নির্যাতন শুরু করে।
যখন তখন তাঁকে পিটানো হতো।
দুপুরে উত্তপ্ত বালুর ওপর তাঁকে উদোম করে শুইয়ে দেয়া হতো।
পিঠের ওপর চাপানো হতো ভারী পাথর খণ্ড।
প্রচণ্ড গরম আর পাথরের চাপে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন।

একদিন উমাইয়া এবং তার ছেলে মিলে তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে উত্তপ্ত বালুর ওপর ছুঁড়ে দেয়।
উমাইয়ার ছেলে আবু ফাকীহাকে (রা) বলে, "আমার আব্বা কি তোমার রব নয়?"
উত্তপ্ত বালুতে পড়ে ছটফট করছিলেন তিনি।
সেই অবস্থাতেও ঈমানের বলে বলীয়ান আবু ফাকীহা (রা) বলে ওঠেন, "অবশ্যই নয়। আমার রব একমাত্র আল্লাহ।"
এই জওয়াব শুনে উমাইয়ার ছেলে আবু ফাকীহার (রা) গলা চেপে ধরে।
তাঁর জিহ্বা বেরিয়ে পড়ে।
অজ্ঞান হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ওই সময় আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) ওই পথে কোথাও যাচ্ছিলেন।
তিনি মোটা অংক দিয়ে আবু ফাকীহাকে (রা) কিনে নেয়ার প্রস্তাব দেন।
উমাইয়া রাজি হয়।
আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) তাঁকে কিনে নেন।
বাড়িতে নিয়ে তিনি তাঁকে আযাদ করে দেন।
এর পরও অন্য মুসলিমদের মতো তিনিও অত্যাচারের সম্মুখীন হতে থাকেন।
অবশেষে তিনি হাবশায় হিজরাত করেন।

খাব্বাব ইবনুল আরাতের (রা) ঈমানী দৃঢ়তা

খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) বানু তামীমের এক সন্তান।
অন্য এক গোত্রের আক্রমণে তাঁর গোত্রটি পরাজিত হয়।
আক্রমণকারীরা পুরুষদেরকে হত্যা করে এবং নারী ও ছোট ছেলেমেয়েদেরকে দাসে পরিণত করে।
খাব্বাব (রা) ছিলেন ছোটদের একজন।

হাত বদল হয়ে হয়ে তিনি পৌঁছেন মাক্কার বাজারে।
বানু খুজায়া'র উম্মু আন্‌মার নামের এক মহিলা তাঁকে কিনে নেয়।
উম্মু আন্‌মার তাঁকে কর্মকারের কাজে নিয়োজিত করে।
একজন সৎ ও কর্মঠ তরুণ রূপে তিনি গড়ে ওঠেন।

যুবক খাব্বাব (রা) জানতে পেলেন যে, মুহাম্মাদ (সা) নামক এক ব্যক্তি নতুন দীন প্রচার করছেন।
খোঁজ করে করে তিনি পৌঁছলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে।
তাঁর মুখে আল কুরআনের বাণী শুনে তিনি মুগ্ধ হন।
তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
খাব্বাব (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন না।
নিঃসংকোচে অন্যদের কাছে তিনি দীনের কথা বলা শুরু করেন।
কয়েক দিনের মধ্যে এই খবর পৌঁছলো উম্মু আন্‌মারের কাছে।
উম্মু আন্‌মার তার ভাই সিবা' ইবনু আবদিল উয্‌যা ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে খাব্বাবের (রা) কর্মস্থলে আসে।
সিবা' বলে, "তোমার সম্পর্কে আমরা কিছু কথা শুনেছি।"

তিনি বললেন, "কি কথা?"

সিবা' বলে, "তুমি নাকি ধর্মত্যাগী হয়ে বানু হাশিমের এক যুবকের অনুসারী হয়েছো?"

তিনি বললেন, "আমি ধর্মত্যাগী হইনি। তবে লা-শারীক আল্লাহ্র ওপর ঈমান এনেছি, মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়েছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই সিবা' ও তার সাথীরা নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ওপর।

অনবরত কিল-ঘুষি খেতে খেতে তিনি মাটিতে পড়ে যান।

তারা তাঁকে পা দিয়ে পিষতে থাকে।

অন্য একদিন খাব্বাব (রা) আল্লাহর রাসূলের (সা) সান্নিধ্য থেকে তাঁর কারখানায় ফিরে আসেন।

সেখানে ছিলো একদল লোক।

তারা যখন জানতে পেলো যে খাব্বাব (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে এসেছেন, তারা তাঁকে মারতে শুরু করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

জ্ঞান ফিরে এলে দেখেন তাঁর দেহ ক্ষত-বিক্ষত এবং পোষাক রক্ত-রঞ্জিত।

মাক্কার মুশরিক নেতাদের নির্দেশে সিবা' ইবনু আবদিল উযযা ও তার সাথীরা খাব্বাবকে (রা) লোহার পোষাক পরিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে দাঁড় করিয়ে রেখে শাস্তি দিতে থাকে।

প্রচণ্ড গরমে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন।

পিপাসায় ছটফট করতেন।

এই অবস্থায় তাঁকে বলা হতো, "মুহাম্মাদ সম্পর্কে এখন তোমার বক্তব্য কি?"

দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বলতেন, "তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নেওয়ার জন্য তিনি আমাদের নিকট এসেছেন।”

আবারো শুরু হতো মারপিট।

একবার তারা হাপরে কতগুলো পাথর টুকরো গরম করে সেইগুলো বিছিয়ে তার ওপর তাঁকে শুইয়ে দেয়।

একজন বলবান ব্যক্তি তাঁর বুকের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে।

তাঁর পিঠের গোশত খসে পড়ে।

মাঝেমধ্যে উম্মু আন্‌মার দোকানে আসতো।

হাপরে লোহার পাত গরম করে সে তাঁর মাথায় ঠেসে ধরতো।

ব্যথায় তিনি ছটফট করতেন।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।

দিনের পর দিন তিনি নির্যাতিত হতে থাকেন।

কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করে কুফরে ফিরে যেতে রাজি হননি।

খুবাইব ইবনু আদী আল আনছারীর (রা) ঈমানী দৃঢ়তা

খুবাইব (রা) ছিলেন ইয়াসরিবের বানু আউসের একসন্তান।
মুস'আব ইবনু উমাইর (রা) তখন ইয়াসরিবে ব্যাপক দা'ওয়াতী তৎপরতা চালাচ্ছিলেন।
একের পর এক ইয়াসরিববাসী ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন।
আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) হিজরাত করে আসার পূর্বে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন খুবাইব (রা) ছিলেন তাঁদের একজন।
আল্লাহর রাসূলের (সা) আগমনের পর ইয়াসরিব আল মাদানী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।
মাক্কার মুশরিকরা এই নব-গঠিত রাষ্ট্রের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়।
হিজরী দ্বিতীয় সনে সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধ।
হিজরী তৃতীয় সনে সংঘটিত হয় উহুদ যুদ্ধ।
খুবাইব (রা) উভয় যুদ্ধে অংশ নেন।
উহুদ যুদ্ধে মাক্কার মুশরিকদের সাথে এসেছিলো বানু লাহ্ইয়ান।
এই যুদ্ধে বানু লাহ্ইয়ানের সরদারের দুই ছেলে মুসলিম মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়।
প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বানু লাহ্ইয়ান এক ফন্দি আঁটে।
বানু আদল ও বানু কারাহ্-র কয়েক ব্যক্তিকে আল মাদীনায় পাঠায়।
তারা বলে যে তাদের গোত্রের বহুসংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত।
তবে আলমাদীনা থেকে কয়েকজন মুবাল্লিগ গেলেই তারা ইসলাম গ্রহণ করবে।
আল্লাহর রাসূল (সা) ছয় সদস্য বিশিষ্ট একদল মুবাল্লিগ তাদের সাথে পাঠান।
বানু লাহ্ইয়ান আগে থেকেই ওঁত পেতে বসেছিলো।
মুসলিম মুবাল্লিগগণ সেখানে উপস্থিত হলে তারা তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।
কয়েকজন মুবাল্লিগ শহীদ হন।
কয়েকজন হন বন্দী।
খুবাইব ইবনু আদী (রা) ছিলেন বন্দীদের একজন।
তাঁকে মাক্কার বাজারে নিয়ে আসা হয়।
বদর রাণাংগনে নিহত হারিস ইবনু আমেরের আত্মীয়রা তাঁকে কিনে নেয়।
খুবাইবকে (রা) তারা বন্দী করে রাখে।

রশিতে বাঁধা অবস্থায় কুড়িজন লোক তাঁকে প্রহার করে।
অতপর স্থির হয় তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হবে।
তানঈম নামক স্থানে তৈরি হয় ফাঁসির মঞ্চ।
নির্দিষ্ট দিনে বহুসংখ্যক লোক সেখানে সমবেত হয়।
খুবাইবকে (রা) জিজ্ঞেস করা হয় তাঁর অন্তিম অভিপ্রায়।
তিনি দুই রাকাআ'ত ছালাত আদায়ের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।
তাঁকে সেই সুযোগ দেয়া হয়।
নিবিষ্ট মনে তিনি ছালাত আদায় করেন।
তিনি তখন কবিতার মাধ্যমে তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করেন।
তাঁর বক্তব্যের একাংশ ছিলো নিম্নরূপ :
"দীনে হকের দুশমনরা আঘাতে আঘাতে আমার শরীরের গোশত ভরতা করে দিয়েছে। আমি আমার অসহায়ত্বের কথা আমার স্রষ্টার নিকট পেশ করছি। আল্লাহর কসম, আমি যখন আল্লাহর পথেই জীবন দিচ্ছি তখন পরোয়া নেই কোন দিকে পড়ে দিচ্ছি কিংবা কিভাবে দিচ্ছি।"

ফাঁসিমঞ্চে তুলে মুশরিকরা জিজ্ঞেস করলো, "মুহাম্মাদকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তোমাকে ছেড়ে দিলে নিজের ঘরে আরামে অবস্থান করাকে কি তুমি পছন্দ করবে?"
খুবাইব (রা) বুলন্দ কণ্ঠে বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি তো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র গায়ে একটি কাঁটা ফুটুক তাও সহ্য করতে প্রস্তুত নই।"
এবার মুশরিকরা তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়।
কয়েক ব্যক্তি একের পর এক বল্লমের আঘাত হেনে তাঁর শরীর জর্জরিত করে ফেলে।
কালেমাতুত্ তাওহীদ পাঠ করতে করতে খুবাইব ইবনু আদী (রা) শাহাদাত বরণ করেন।
পেছনে রেখে যান নিখাদ ঈমানের অনুপম উদাহরণ।

হাবীব ইবনু যায়িদের (রা) ঈমানী দৃঢ়তা

হাবীব ইবনু যায়িদ ইবনু আসিম (রা) ছিলেন ইয়াসরিবের বানু নাজজারের এক সন্তান।
তাঁর আম্মা ছিলেন বিশিষ্ট মহিলা ছাহাবী উম্মু আম্মারা (রা)।
তিনি ছিলেন একজন সত্য-সন্ধানী মানুষ।
তাঁর কাছে পৌঁছে ইসলামের আহ্বান।
তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ মুসলিম।
আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল জীবন-যাপন করে চলছিলেন।

মুহাম্মাদ (সা) ছিলেন শেষ নবী।
আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর জীবদ্দশায় চারজন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটে।
এদের একজন ছিলো মুসাইলামা।
আরবের ইয়ামামা অঞ্চলে ছিলো তার বাস।
সে ছিলো বানু হানীফার সরদার।
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে মুসলিমরা মাক্কা বিজয় করলে গোটা আরবে ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।
দূর দূরান্ত থেকে বহুসংখ্যক গোত্রের প্রতিনিধিরা আল মাদীনায় এসে মহানবীর (সা) হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করে।
বানু হানীফার সরদার মুসাইলামাও এসেছিলো।

সে লক্ষ্য করলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) অনুসারীরা তাঁকে দারুন ভালোবাসে।
তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।
সে ভাবলো, নবী হওয়ার কারণেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) এই পজিশন।
তার মনে দুষ্ট বুদ্ধি জাগে।

সখ জাগে নবী বলে আখ্যায়িত হওয়ার।
দ্রুত সে ইয়ামামা ফিরে যায়।
গোত্রের লোকদেরকে জড়ো করে দাবি করে যে সেও নবী।
গোত্রের লোকেরা ধোঁকায় পড়ে যায়।
তারা তাকে নবী বলে মেনে নেয়।
পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোর ওপরও সে প্রভাব বিস্তার করে।
গড়ে তোলে একটি সেনাবাহিনী।
প্রস্তুতি নিতে থাকে আল মাদীনা আক্রমণের।

ইতিমধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করেন।
আবু বাকর আছ ছিদ্দিক (রা) খালীফা হন।
তিনি মুসাইলামাকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠান।

এই সময় হাবীব (রা) কোন এক কাজে ওমান গিয়েছিলেন।
কাজ শেষে তিনি আল মাদীনা ফিরছিলেন।
পথিমধ্যে তিনি নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার মুসাইলামার হাতে পড়েন।
মুসাইলামা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, "মুহাম্মাদ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?"
নির্ভীক চিত্তে হাবীব ইবনু যায়িদ (রা) বললেন, "তিনি আল্লাহর রাসূল।"
মুসাইলামা বললো, "না। বরং বল মুসাইলামা আল্লাহর রাসূল।"
হাবীব (রা) এই মিথ্যা কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেন।
মুসাইলামা রেগে যায়।
সে তলোয়ারের আঘাতে হাবীবের (রা) একটি হাত কেটে ফেলে এবং বলে,
"এখন আমার কথা মানবে কি?"
দৃঢ়কণ্ঠে হাবীব জওয়াব দেন, "অবশ্যই নয়।"
মুসাইলামা তলোয়ারের আঘাতে তাঁর অপর হাতটিও কেটে ফেলে এবং তাকে নবী বলে ঘোষণা দিতে বলে।
হাবীব ইবনু যায়িদের (রা) দুইটি হাত শহীদ হয়ে গেছে।

কর্তিত বাহু থেকে রক্ত ঝরছে অবিরাম।

ব্যথায় তিনি জর্জরিত।

এই কঠিন মুহূর্তেও খাঁটি মুমিন হাবীব ইবনু যায়িদ (রা) বললেন, "অবশ্যই নয়, অবশ্যই নয়। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।"

ক্রুদ্ধ মুসাইলামা হাবীব ইবনু যায়িদের (রা) শরীরের প্রতিটি ভাঁজে তলোয়ার চালায়।

টুকরো টুকরো করে ফেলে তাঁর শরীর।

কিন্তু সে হাবীব ইবনু যায়িদের (রা) ঈমানী দৃঢ়তায় ধরাতে পারেনি এতোটুকু চিড়।

নিখাদ ঈমান নিয়েই হাবীব (রা) শাহাদাত বরণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা আস্‌সাহামীর (রা) ঈমানী দৃঢ়তা

আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা আস্‌সাহামী (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) দাওয়াতী চিঠি ইরানের কিসরার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে তিনি রোমের কাইসারের দরবারে বড়ো রকমের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

এক যুদ্ধে কিছু সংখ্যক মুসলিম খৃস্টান রোমানদের হাতে বন্দী হয়ে যান।

বন্দীদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনু হুযাফাও (রা) ছিলেন।

তাঁকে ধরে কাইসারের সামনে নেয়া হয়।

কাইসার তাঁকে খৃস্টবাদ গ্রহণ করতে বলেন।

আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা (রা) জওয়াবে বললেন, "আপনি যেই প্রস্তাব রেখেছেন তার চেয়ে বরং মৃত্যুকেই আমি হাজার বার খোশ আমদেদ জানাবো।"

কাইসার বললেন, "আপনি ভালোভাবে ভেবে দেখুন।

খৃস্টবাদ গ্রহণ করলে আপনাকে ক্ষমতার অংশীদার বানাবো।"

আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা (রা) বললেন, "আল্লাহর শপথ, খৃস্টবাদ গ্রহণের বিনিময়ে যদি গোটা রোমান সাম্রাজ্য এবং গোটা আরব দেশ আমার হাতে তুলে দেয়া হয় তাহলেও ক্ষণিকের জন্যও আমি ইসলাম ত্যাগ করবো না।"

প্রলোভন দিয়ে বাগে আনতে না পেরে কাইসার এবার আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফাকে (রা) হত্যার হুমকি দিলেন।

বলিষ্ঠকণ্ঠে আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা (রা) বললেন, "আপনার যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। কিন্তু আমি এক মুহূর্তের জন্যও ইসলাম ত্যাগ করবো না।"

এবার কাইসারের নির্দেশে তাঁকে টেনে হেঁচড়ে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়।

ভয় দেখাবার জন্য তাঁর হাত ও পা ঘেঁষে তীর চালানো হয়।
কাইসার আবারো তাঁকে খৃস্টবাদ গ্রহণের আহ্বান জানান।
নির্ভীক চিত্তে আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা (রা) আবারো তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।
কাইসারের নির্দেশে এবার বড়ো ডেকচিতে তেল ঢেলে তা ফুটানো হয়।
একজন মুসলিম বন্দীকে সেই ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করা হয়।
বন্দীর সমস্ত শরীর সিদ্ধ হয়ে যায়।
হাড় থেকে গোশত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
ছটফট করে সেই বন্দী মৃত্যু বরণ করেন।
এই দৃশ্য দেখিয়ে কাইসার আবারো তাঁকে খৃস্টবাদ গ্রহণের আহ্বান জানান।
আল্লাহর কাছে যিনি জান ও মাল বিক্রয় করে দিয়েছেন তাঁকে টলাবার সাধ্য কার!
আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা (রা) আবারো দৃঢ়ভাবে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।
কাইসার বিস্মিত হলেন।
একজন বন্দীর কাছে তিনি হেরে গেলেন।
কোন প্রকারে আত্ম-সম্মান বাঁচাবার লক্ষ্যে তিনি এবার একটি নতুন প্রস্তাব দেন।
তিনি বলেন, "আপনি যদি আরবী প্রথা অনুযায়ী আমার মাথায় চুমো দেন তাহলে আপনাকে মুক্তি দেয়া হবে।"
বুদ্ধিদীপ্ত আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা (রা) বললেন, "এর বিনিময়ে আপনি যদি মুসলিম বন্দীদেরকে মুক্তি দেন তাহলে আমি এই প্রস্তাব বিবেচনা করতে পারি।"
কাইসার নিজের মর্যাদা রক্ষার শেষ সুযোগটুকু হাত ছাড়া করলেন না।
তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা (রা) কাইসারের মাথায় একটি চুমো দেন।
আর কাইসার ওয়াদা রক্ষার্থে বন্দী মুসলিমদেরকে ছেড়ে দেন।
আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা (রা) মুক্ত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে সানন্দে আল মাদীনার পথ ধরেন।

আছহাবে
রাসূলের
আদ্ দা'ওয়াতু
ইলাল্লাহ

আবু বাকর আছ ছিদ্দিকের (রা)
আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ

আবু বাকর আবদুল্লাহ আতীক আছ ছিদ্দিক (রা) ছিলেন বানু তায়িমের এক সুযোগ্য সন্তান।
তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী।
ব্যবসায়িক কারণেই মাক্কায় বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী যুবকের সাথে তাঁর ছিলো নিবীড় সম্পর্ক।
আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো গভীরতম।

খৃস্টীয় ৬১০ সনে মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন।
মুহাম্মাদ (সা) আবু বাকরের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করার সাথে সাথেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি লেগে যান আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহর কাজে।

তিনি তাঁর ব্যবসায়ী বন্ধু উসমান ইবনু আফফান (রা), তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা), আয্ যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) এবং সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাসের (রা) নিকট ইসলামের মর্মকথা তুলে ধরেন।
তাঁরা সত্যের সাথে পরিচিত হয়ে অবিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।

অতপর তিনি উসমান ইবনু মাযউন (রা), আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা), আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রা), আবু সালামা ইবনু আবদিল আসাদ (রা) এবং আল আরকাম ইবনু আবিল আরকামের (রা) নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন।

তাঁরা ইতিবাচক সাড়া দেন।
তিনি তাঁদেরকে নিয়ে উপস্থিত হন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে।
তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এইসব যুবক ছিলেন মৌলিক মানবীয় গুণে সমৃদ্ধ।
জাহিলী সমাজের বহুবিধ পংকিলতা থেকে তাঁরা ছিলেন মুক্ত।
তাঁদেরকে ইসলামের দিকে টেনে আনার ক্ষেত্রে আবু বাকর আছ ছিদ্দিক (রা) বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।
একেবারে প্রাথমিক পর্বেই আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহর কাজে তিনি অর্জন করেন বড়ো রকমের সাফল্য।

তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ্‌র (রা)
আদ্‌ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ

আবু মুহাম্মাদ তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা) ছিলেন বানু তায়িমের সন্তান।
আবু বাকর আছ ছিদ্দিকের (রা) অনুপ্রেরণায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
আম্মা এবং গোত্রের লোকদের বিরোধিতার কারণে তিনি খুবই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।
তাঁর গতিবিধির ওপর মুশরিকরা নজরদারি করতে থাকে।
তিনি সহজে অন্যদের সাথে মেলামেশা করতে পারতেন না।

কিন্তু যেই সত্যের সাথে তিনি পরিচিত হয়েছেন সেই সত্যের সাথে যে অন্যদেরকেও পরিচিত করে তুলতে হবে।
তিনি সময়-সুযোগ বুঝে ঘর থেকে বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন বাড়িতে তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হতেন।
নানা বিষয়ে আলাপ করতেন।
অবশেষে তাদের সামনে তুলে ধরতেন ইসলামের মর্মকথা।

মাঝে মধ্যে তিনি মাক্কার বাইরে চলে যেতেন।
পৌঁছতেন তাঁবুবাসী বেদুঈনদের কাছে।
তাদের কাছে পেশ করতেন ইসলামের বাণী।

কখনো কখনো তিনি মাক্কার নিকটবর্তী কোন না কোন উপত্যকায় চলে যেতেন।
সুদূর অঞ্চল থেকে আগত ব্যক্তিদের অপেক্ষায় থাকতেন।
তারা কাছে এলে তাদের সাথে আলাপ করতেন।
আলাপ-আলোচনার কোন এক পর্যায়ে তাদের সামনে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরতেন।
তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতেন।

এইভাবে দিনের পর দিন তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা) আদ্‌ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ-র কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

মুস'আব ইবনু উমাইরের (রা) আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ্

মাক্কার একজন সৌখিন যুবক ছিলেন মুস'আব ইবনু উমাইর (রা)।
দামি দামি পোশাক পরা আর নানা প্রকারের সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা ছিলো তাঁর সখ।
একদিন তিনি জানতে পেলেন, 'আল আমিন' মুহাম্মাদ (সা) নতুন দীন প্রচার করছেন।
তিনি অবগত হলেন নতুন দীনের মর্মকথা।
সত্যের সাথে পরিচিত হয়ে তিনি পুলকিত হয়ে ওঠেন।
তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
ইসলাম তাঁর জীবনে নিয়ে আসে মহা পরিবর্তন।

নতুন দীন গ্রহণের কথা জানতে পেরে তাঁর আম্মা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন।
তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে ধরে বেদম পিটুনি দেয়।
অতপর তাঁকে একটি কুঠরীতে বন্দী করে রাখে।
সেই কুঠরীতে তিনি বন্দী থাকেন বহুদিন।
একদিন তিনি কুঠরীর দেয়াল টপকিয়ে পালাতে সক্ষম হন।
চলে যান হাবশা।

কিছুকাল পর তিনি মাক্কায় আসেন।
দেখেন, মুসলিমরা আরো বেশী কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন।

নবুওয়াতের একাদশ সনে মিনার নিকটবর্তী আকাবা নামক স্থানে ইয়াসরিবের বানু খাযরাজের ছয় ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।
ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে তাঁরা নতুন দীনের কথা প্রচার করতে থাকেন।
নবুওয়াতের দ্বাদশ সনে ইয়াসরিবের বারো জন বিশিষ্ট ব্যক্তি আকাবায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন।

তাঁরা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন-যাপনের অংগীকার ব্যক্ত করেন। এই ঘটনাকেই বলা হয় প্রথম বাই'আতে আকাবা।

এই বাই'আতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আস'আদ ইবনু যুরারা (রা), রাফে ইবনু মালিক (রা), উবাদা ইবনুস সামিত (রা) এবং আবুল হাইসাম ইবনুত্ তাইয়িহানও (রা) ছিলেন।
ইয়াসরিবের নও-মুসলিমদেরকে আল-কুরআন শেখানো, তাঁদের ছালাতে ইমামত করা এবং আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহর কাজ করার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বারো জন ইয়াসরিববাসীর সাথে মুস'আব ইবনু উমাইরকে (রা) পাঠিয়ে দেন।
মুস'আব ইবনু উমাইর (রা) আস'আদ ইবনু যুরারার (রা) বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করেন।

আস'আদ ইবনু যুরারাকে (রা) সাথে নিয়ে তিনি ইয়াসরিব এবং নিকটবর্তী পল্লীগুলোতে দাওয়াতী কাজ করতে থাকেন।
মুস'আব ইবনু উমাইরের (রা) ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইয়াসরিবের সেরা ব্যক্তিত্ব উসাইদ ইবনু হুদাইর (রা), সা'দ ইবনু মুয়াজ (রা) এবং সা'দ ইবনু উবাদা (রা)সহ বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।
ইয়াসরিবে ইসলামের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়।

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ সনে ইয়াসরিবের নও-মুসলিমদের পক্ষ থেকে পঁচাত্তর জন প্রতিনিধি আকাবায় এসে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন। তাঁরা ইসলামের পক্ষে সর্বশক্তি নিয়োজিত করার অংগীকার ব্যক্ত করেন। এই অংগীকারকেই বলা হয় দ্বিতীয় বাই'আতে আকাবা।

ইয়াসরিবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং গণ-মানুষের কাছে ইসলামকে সুপরিচিত করে তোলার ক্ষেত্রে মুস'আব ইবনু উমাইরের (রা) অবদান ছিলো অসাধারণ।

আবু মূসা আল আশ'য়ারীর (রা)
আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ

আবু মূসা আবদুল্লাহ ইবনু কায়েস আল আশ'য়ারী (রা) ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন।
সুদূর ইয়ামানে থেকেই তিনি শুনতে পান যে মাক্কায় মুহাম্মাদ (সা) নামে এক ব্যক্তি নতুন দীন প্রচার করছেন।
তিনি এই দীন সম্পর্কে জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।
খাদ্য ও পানীয় উটের পিঠে চাপিয়ে তিনি রওয়ানা হন মাক্কার পথে।

সুদীর্ঘ পথ।
মানযিলের পর মানযিল অতিক্রম করে তিনি মাক্কায় আসেন।
একদিন তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সান্নিধ্যে পৌছেন।
তাঁর মুখে আল কুরআনের বাণী শুনে এবং এক অদ্বিতীয় আল্লাহর পরিচয় লাভ করে তৃপ্ত হন।
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেন।
তিনি কিছুদিন মাক্কায় অবস্থান করেন এবং ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত হন।
অতপর তিনি বানু আল আশ'য়ারের নিকট ইসলামের মর্মকথা পৌছে দেয়ার জন্য ইয়ামানে ফিরে যান।

অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি ইসলামের পরিচয় লোকদের সামনে তুলে ধরতে থাকেন।
তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা আল্লাহ্ কবুল করেন।
বহু সংখ্যক লোক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আল মাদীনায় হিজরাত করেন।
আবু মূসা আবদুল্লাহ আল আশ'য়ারী (রা) বাছাই করা পঞ্চাশ জন নও-মুসলিমকে নিয়ে নৌ-পথে আল মাদীনার দিকে রওয়ানা হন।
প্রতিকূল আবহাওয়া তাঁদেরকে নিয়ে যায় হাবশার (ইথিওপিয়ার) উপকূলে। বন্দরে পৌছে তাঁরা দেখেন জাফর ইবনু আবী তালিবের (রা) নেতৃত্বে হাবশায় অবস্থানরত মুসলিমরা আল মাদীনার উদ্দেশ্যে নৌ-যানে আরোহন করছেন।

আবু মূসা আল আশ'য়ারী (রা) তাঁর পঞ্চাশ জন সাথীসহ সেই কাফিলায় শামিল হন।
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) খাইবার জয় করে যেইদিন আল মাদীনায় ফেরেন সেইদিন তাঁরাও সেখানে পৌছেন।
আবু মূসা আল আশ'য়ারী (রা) ও তাঁর সাথীরা আল মাদীনায় অবস্থান করে আল্লাহর রাসূলের (সা) নিকট থেকে দীনের ইলম হাছিল করতে থাকেন।

তুফাইল ইবনু আমরের (রা)
আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ

তুফাইল ইবনু আমর আদ্ দাওসী (রা) আরবের তিহামা অঞ্চলে বাস করতেন।

তিনি ছিলেন একজন কবি।

আবার একজন সফল ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি প্রায়ই মাক্কায় আসতেন।

কুরাইশ নেতাদের মেহমান হতেন।

একবার তিনি মাক্কায় এসে দেখেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) এবং পৌত্তলিক কুরাইশদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে।

পৌত্তলিক নেতারা তাঁকে সাবধান করে দেয়।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের (সা) বিরুদ্ধে নানা কথা বলে তাঁর কান ভারী করে তোলে।

আল্লাহর রাসূলের (সা) কথা যাদুর মতো কাজ করে বলে তাঁকে সাবধান করে দেয়।

তুফাইল তাওয়াফের জন্য কা'বার চত্বরে যান।

আল্লাহর রাসূলের (সা) কথার প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য দুই কানে তুলা ভরে নেন।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) ছালাত আদায় করছিলেন।

ছালাতে পড়ছিলেন আল-কুরআনের অংশ।

তাওয়াফ কালে তুফাইল (রা) বারবার তাঁকে অতিক্রম করছিলেন।

কানে তুলা থাকা সত্ত্বেও আল-কুরআনের কিছু কিছু শব্দ তিনি শুনতে পান।

তিনি পুলকিত হয়ে ওঠেন।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) ছালাত শেষে বাসস্থানে ফিরে যান।
অন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে ভিন্ন পথে তুফাইল (রা) তাঁর নিকট পৌঁছেন।
তিনি আল্লাহর রাসূলের (সা) বক্তব্য জানতে চান।
আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) তাঁকে সূরা আল-ইখলাছ এবং সূরা আল-ফালাক পড়ে শুনান।
তুফাইল (রা) বুঝতে পেলেন, এটি অবশ্যই আল্লাহর কালাম।
তিনি আল্লাহর রাসূলের (সা) হাতে হাত রেখে উচ্চারণ করেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

আরো কিছু দিন তিনি মাক্কায় অবস্থান করেন।
বিভিন্ন সময় রাসূলের (সা) কাছে গিয়ে দীনী ইলম হাছিল করেন।
এবার ব্যবসায়ী নয়, দীনের মুবাল্লিগ হিসেবে তিনি ফেরেন নিজের এলাকায়।

প্রথমে তাঁর আব্বা ও স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেন।
আর ইসলাম গ্রহণ করেন প্রতিভাবান এক যুবক যাঁর নাম হয়েছিলো আবু হুরাইরা (রা)।

তুফাইল (রা) মাঝে মধ্যে মাক্কায় আসতে থাকেন।
অবগত হতে থাকেন নতুন অবতীর্ণ বিধান।
একবার তাঁর উপস্থিতিতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) তাঁর গোত্রের লোকদের জন্য দু'আ করেন।
তুফাইল (রা) তাঁর গোত্রে ফিরে গিয়ে নতুন উৎসাহ নিয়ে আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহর কাজ করতে থাকেন।
আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর প্রচেষ্টা কবুল করেন।

ইতিমধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াসরিবে হিজরাত করেন।
গড়ে তোলেন ইসলামী রাষ্ট্র আল-মাদীনা আল-মুনাওয়ারা।
হিজরাতের পর একে একে কেটে যায় পাঁচটি বছর।

অতপর তুফাইল ইবনু আমর আদ্ দাউসী (রা) তাঁর দাওয়াতের ফসল ৮০টি পরিবার নিয়ে আল-মাদীনায় আসেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) নও-মুসলিমদের এই বিরাট বাহিনী দেখে দারুন খুশি হন।

ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান হাছিলের পর বানু আদ্ দাউস তাদের এলাকায় ফিরে যায়।

তুফাইল ইবনু আমর আদ্ দাউসী (রা) আল-মাদীনাকেই তাঁর স্থায়ী অবস্থান স্থল রূপে বেছে নেন।

অবশ্য মাঝে মধ্যে তিনি বানু আদ্ দাউসের এলাকায় গিয়ে লোকদেরকে দীনী তা'লিম দিতেন।

উমাইর ইবনু ওয়াহাবের (রা)
আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ

উমাইর ইবনু ওয়াহাব (রা) বদর যুদ্ধে মাক্কার মুশরিক বাহিনীর একজন সৈনিক ছিলেন।
বদর যুদ্ধে মাক্কার বড় বড় নেতারা নিহত হয়।
তাদের মৃত্যুতে তিনি খুব ব্যথিত হন।
একদিন কা'বার চত্বরে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার সাথে পরামর্শ করে তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যা করার জন্য আল-মাদীনায় আসেন।

মাসজিদে নববীতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাত করেন।
আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁকে জানালেন, তিনি কা'বার চত্বরে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার সাথে কী কী আলাপ করেছেন।
উমাইর ইবনু ওয়াহাব (রা) হতভম্ব হয়ে গেলেন।
তাঁর কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে কা'বার চত্বরে দুই জন মানুষের গোপন আলাপের বিষয়টি নিশ্চয়ই আল্লাহই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) জানিয়েছেন।
তিনি বলে উঠলেন, "আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহ" [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।]
উমাইর ইবনু ওয়াহাব (রা) বেশ কিছু দিন আল-মাদীনায় অবস্থান করেন।
ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান হাছিল করেন।

একদিন উমাইর (রা) আল্লাহর রাসূলকে (সা) উদ্দেশ্য করে বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আমার জীবনের বিরাট অংশ আল্লাহর নূর নিভিয়ে দেয়ার চেষ্টায় কাটিয়েছি, ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর উৎপীড়নে কাটিয়েছি।

আমার ইচ্ছা, আপনি অনুমতি দিলে, আমি মাক্কায় যাবো এবং কুরাইশদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) পথে আহ্বান জানাবো।"

বদর যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীর পরাজয়ের পর মাক্কার পরিস্থিতি অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলো।

আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁকে মাক্কায় যাওয়ার অনুমতি দেন।

উমাইর ইবনু ওয়াহাব (রা) মাক্কায় আসেন।

তিনি সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার নিকট যান।

তার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন।

ক্রুদ্ধ সাফওয়ান তাঁকে গালমন্দ করে স্থান ত্যাগ করে।

উমাইর (রা) মাক্কার বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে গিয়ে ইসলামের মর্মকথা তুলে ধরতে থাকেন।

তিনি মাক্কাতে ছিলেন মাত্র কয়েক সপ্তাহ।

তিনি যখন মাক্কা থেকে আল-মাদীনায় ফিরেন তখন তাঁর সাথে ছিলো তাঁর আহ্বানে সাড়া দানকারী নও-মুসলিমদের একটি বড়ো দল।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের (রা)
আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ

মাক্কার অন্যতম বড়ো নেতা আল ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা ছিলো ইসলামের কট্টর দুশমন।
তার পুত্র খালিদ (রা) প্রথমে তাঁর আব্বারই অনুসারী ছিলেন।

খালিদ (রা) ছিলেন খুবই সাহসী সৈনিক।
উহুদ যুদ্ধে তিনি মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন।
তাঁর আক্রমণেই মুসলিম বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ধীরে ধীরে তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।
তিনি ইসলাম গ্রহণ করার অভিপ্রায় নিয়ে আল-মাদীনার পথ ধরেন।
আমর ইবনুল আস (রা) ছিলেন আরেক লড়াকু ব্যক্তি।
তাঁর মনও সাক্ষ্য দেয় যে ইসলাম সত্য দীন।
ফলে তিনি আল-মাদীনার দিকে অগ্রসর হন।
পথে খালিদের (রা) সাথে তাঁর দেখা।
আলাপ-আলোচনায় জানা গেলো উভয়ের উদ্দেশ্য এক।
যথাসময়ে তাঁরা আল-মাদীনা পৌঁছেন।
আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁদেরকে দূর থেকে দেখে খুবই খুশি হন।
উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে তিনি বলেন, "মাক্কা তার কলিজার মূল্যবান টুকরোগুলো তোমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে।"
আল্লাহর রাসূলের (সা) হাতে হাত রেখে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন।
তখন থেকে তাঁদের তলোয়ার ইসলামের বিজয়ের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে।

শুধু যোদ্ধা হিসেবে নয়, ইসলামের মুবাল্লিগ হিসেবেও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের (রা) রেকর্ড খুবই উজ্জ্বল।

হিজরী নবম সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে মুবাল্লিগ হিসেবে বানু জুজাইমার নিকট পাঠান।

তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বানু জুজাইমা ইসলাম গ্রহণ করে।

হিজরী দশম সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার জন্য নাজরান পাঠান।

তিনি যোগ্যতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বানু আবদিল মাদ্দান ইসলাম গ্রহণ করে।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) কিছুকাল নাজরানে অবস্থান করে নও-মুসলিমদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলেন।

হিজরী দশম সনেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ইসলামের মুবাল্লিগ হিসেবে ইয়ামান পাঠান।

অতপর সেখানে প্রেরিত হন আলী ইবনু আবী তালিব (রা)।

উভয়ের প্রচেষ্টায় বিপুল সংখ্যক ইয়ামানবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বিভিন্ন রণাংগনে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিত্ব করেন।

রণাংগনে শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হয়েও তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানাতেন।

অর্থাৎ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) সর্বাবস্থায় আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ-র দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন।

জামাম ইবনু সা'লাবার (রা)
আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ্

হিজরী নবম সন।
ইসলামের আওয়াজ পৌঁছে গেছে সুদূর নাজদেও।
সেখানকার অন্যতম গোত্র ছিলো বানু সা'দ।
গোত্রের লোকেরা জামাম ইবনু সা'লাবাকে (রা) আল-মাদীনায় পাঠায় তাদের প্রতিনিধি রূপে।

উটে চড়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে একদিন তিনি আল মাদীনা পৌঁছেন।
আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) কয়েকজন ছাহাবীকে নিয়ে তখন মাসজিদে বসা।
লোকেরা দেখলো, একজন বেদুঈন তাঁর উটটি মাসজিদের কোণে বেঁধে সোজা ভেতরে ঢুকে গেলেন।
তিনি জানতে চাইলেন, "মুহাম্মাদ কে?"
আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর পরিচয় দিলেন।
বেদুঈন তাঁকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেন।
আল্লাহর রাসূল (সা) সেইগুলোর জওয়াব দেন।
আগন্তুক আল্লাহর রাসূলের (সা) হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেন।
অতপর আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁকে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন।
বেদুইন লোকটি বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি জামাম ইবনু সা'লাবা। আমার গোত্র আমাকে তাদের প্রতিনিধি রূপে পাঠিয়েছে। সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন, আপনি আমাকে যা শিখালেন আমি তার কমও করবো না, বেশিও করবো না।"
এই কথাগুলো বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

উটে চড়ে নাজদের পথ ধরলেন।

তাঁর গমণ পথের দিকে তাকিয়ে থেকে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, "ওই উসকু খুশকো চুলওয়ালা ব্যক্তিটি যদি সত্য কথা বলে থাকে, তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে জামাম (রা) নাজদ পৌছেন।

তাঁর গোত্রের লোকেরা অধীর আগ্রহে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলো।

বানু সা'দের এলাকায় পৌছে তিনি উট থেকে নামেন।

লোকেরা জড়ো হয় তাঁর পাশে।

তিনি তাদের প্রশ্নের জওয়াব দেন।

অতপর সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন।

পৌত্তলিকতার অসারতা এবং একত্ববাদের মর্মকথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন।

সেই দিন সূর্যাস্তের পূর্বেই বানু সা'দের সকল সদস্য ইসলাম গ্রহণ করেন।

বেদুঈন জামাম (রা) শামিল হন ইসলামের শ্রেষ্ঠ মুবাল্লিগদের কাতারে।

আছহাবে
রাসূলের
আল-কুরআন
চর্চা

আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদের (রা) আল-কুরআন চর্চা

আবদুল্লাহর (রা) আম্মার নাম ছিলো উম্মু আবদ।
সেই জন্য আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদকে (রা) লোকেরা ইবনু উম্মু আবদ বলে ডাকতো।

ছোটবেলা তিনি উকবা ইবনু আবী মুআইতের ছাগল পাল নিয়ে মাক্কার উপত্যকাগুলোতে চরাতেন।
তিনি শুনতেন যে মাক্কায় এক ব্যক্তি নবুওয়াত লাভ করেছেন।
তবে তিনি তাঁকে চিনতেন না।
সারাদিন তিনি ছাগল নিয়ে মাক্কার বাইরেই থাকতেন।
সাঁঝে শহরে ফিরতেন।

একদিন তিনি যথারীতি ছাগল চরাচ্ছিলেন।
সহসা দেখতে পান, দুইজন লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন।
তাঁরা খুব পিপাসার্ত ছিলেন। কাছে এসে একজন বলেন, "ওহে ছেলে, আমরা খুব পিপাসার্ত। কিছু দুধ দুইয়ে তুমি আমাদেরকে দাও।"
আবদুল্লাহ বললেন, "তা আমি পারবো না। ছাগলগুলো তো আমার নয়। আমি একজন রাখাল মাত্র।"
আগন্তুকদের একজন বললেন, "তাহলে আমাদেরকে একটি ছাগী দেখিয়ে দাও যেটি এখনো পাঁঠার স্পর্শে আসেনি।"
ছেলেটি একটি ছাগীর দিকে ইশারা করলো।

আগন্তুক "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলে একটি হাত দিয়ে ছাগীটির ওলান মলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুধ বের হয়।
তিনি গর্ত বিশিষ্ট একটি পাথর টুকরো ওলানের নীচে রাখেন। দুধে তা ভরে যায়।
আগন্তুকদ্বয় দুধ পান করে পিপাসা মিটালেন। ছেলেটিকেও দুধ পান করালেন।
আগন্তুকদের একজন ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)।
দ্বিতীয় জন আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা)।

এই ঘটনার কিছুদিন পর আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) নবুওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে ওঠেন।
একদিন তিনি তাঁর কাছে যান।
তাঁকে দেখে চিনতে পারেন।
তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁকে মনিবরূপে গ্রহণ করে তাঁর সাহচর্যে থাকা শুরু করেন।
আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আল-কুরআন শেখেন।
ইয়াসরিবে (আল-মাদীনায়) হিজরাতের পরও তিনি আল-কুরআন চর্চায় নিবেদিত থাকেন।
তিনি সুমধুর কণ্ঠে আল-কুরআন অধ্যয়ন করতেন।
মাঝেমধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে আল-কুরআন পড়ে শুনাতে বলতেন।

একদিন রাতে আবু বাকর আছ ছিদ্দিক (রা) এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ শেষে তাঁর গৃহ থেকে বেরিয়ে আসেন।
তাঁরা দেখলেন, এক ব্যক্তি মাসজিদে দাঁড়িয়ে ছালাতরত অবস্থায় আল-কুরআন তিলাওয়াত করছেন।

আল্লাহর রাসূল (সা) কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁর তিলাওয়াত শুনলেন।
অতপর তিনি বললেন, “আল-কুরআন যেমন অবতীর্ণ হয়েছে তেমন বিশুদ্ধভাবে তা তিলাওয়াত করে কেউ যদি আনন্দিত হতে চায়, সে যেন ইবনু উম্মু আবদের মতো তিলাওয়াত করে।”
তিনি যে কেবল সুন্দরভাবে আল-কুরআন পাঠ করতে পারতেন, তাই নয়।
তিনি ছিলেন আল-কুরআনের গভীর জ্ঞান সমৃদ্ধ একজন ব্যক্তি।
আলাপ-আলোচনাকালে তাৎক্ষণিকভাবে আল-কুরআনের ভুরিভুরি আয়াত তিনি উদ্ধৃত করতে পারতেন।

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) সময়ের একটি ঘটনা।
উমার (রা) কোন একটি সফরে রাতে আরেকটি কাফিলার সাক্ষাত পান।
রাতের আঁধারে এক কাফিলার লোক অন্য কাফিলার লোকদেরকে চিনতে পারছিলেন না।
উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) দ্বিতীয় কাফিলার লোকদেরকে কিছু প্রশ্ন করেন।
প্রতিটি প্রশ্নের জওয়াবে উচ্চারিত হয় আল-কুরআনের এক একটি আয়াত।
উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ভাবলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) ছাড়া আর কারো এমন যোগ্যতা থাকার কথা নয়।
তিনি সবশেষে প্রশ্ন রাখলেন, “তোমাদের মাঝে কি আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) আছেন?”
জওয়াব এলো, “হ্যাঁ”।

আল-কুরআনের মর্মকথা জানার ক্ষেত্রেও আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) ছিলেন প্রথম সারির ছাহাবীদের একজন।
তদুপরি আজীবন তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে আল-কুরআনের জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার কাজ করে গেছেন।

আবু আবদিল্লাহ সালেমের (রা) আল-কুরআন চর্চা

আবু আবদিল্লাহ সালেম (রা) ছিলেন আবু হুজাইফার (রা) স্ত্রী সুবাইতার (রা) আযাদকৃত দাস।
আবু হুজাইফা (রা) ছিলেন ইসলামের অন্যতম কট্টর দুশমন উতবা ইবনু রাবীয়ার ছেলে।
আবু হুজাইফা (রা) প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন।
তাঁর সাথে আবু আবদিল্লাহ সালেমও (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরাতের নির্দেশ আসার পর তাঁরা ইয়াসরিবে হিজরাত করেন।
আবু আবদিল্লাহ সালেম (রা) নিবিষ্টমনে আল-কুরআন মুখস্থ করতে থাকেন।
তিনি ছিলেন ইলমুল কিরআতে পারদর্শীদের একজন।
তিনি লোকদেরকে আল-কুরআনের তালিম দিতেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে একটি চমৎকার কণ্ঠ দান করেছিলেন।
মাসজিদে বসে তিনি আল-কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলে শ্রোতারা তা মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকতো।
একদিন উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) আল্লাহর রাসূলের (সা) কাছে আসতে দেরি করেন।
আল্লাহর রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেন, "দেরি করলে কেন?"
আয়িশা (রা) জওয়াবে বলেন, "একজন কারী মধুর কণ্ঠে আল-কুরআন পড়ছেন, তা শুনছিলাম।"

কে সেই ব্যক্তি তা জানার জন্য আল্লাহর রাসূল (সা) গায়ে চাদর জড়িয়ে বাইরে আসেন।
দেখেন, সেই কারী হচ্ছেন সালেম।
তিনিও তাঁর তিলাওয়াত শুনেন এবং বলে ওঠেন, "সেই আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা যিনি আমার উম্মাতের মধ্যে তোমার মতো ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন।"

যাঁদের কাছ থেকে আল-কুরআন শেখার জন্য খোদ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) পরামর্শ দিতেন আবু আবদিল্লাহ সালেম (রা) ছিলেন তাঁদের একজন।

উবাই ইবনু কা'বের (রা) আল-কুরআন চর্চা

উবাই ইবনু কা'ব (রা) ছিলেন ইয়াসরিবের (আলমাদীনার) বানু নাজ্জারের এক সন্তান।

মুস'আব ইবনু উমাইরের (রা) মাধ্যমে তিনি ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন।

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ সনে আকাবায় যেই পঁচাত্তর জন ইয়াসরিববাসী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইআত হন তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।

তিনি লেখাপড়া জানতেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরাত করে এলে তিনি কাতিবে ওহী নিযুক্ত হন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যেই কয়জন আনছার ছাহাবী পুরো আল-কুরআন মুখস্থ করেন তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।

উবাই ইবনু কা'ব (রা) ইলমুল কিরাআতেও পারদর্শী ছিলেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদেরকে যাঁদের কাছ থেকে ইলমুল কিরাআত শিখতে বলতেন তিনি ছিলেন তাঁদেরও একজন।

আল-কুরআনের সূরা এবং আয়াতের পরম্পরা সম্পর্কে তিনি সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

আবু বাকর আছ ছিদ্দিকের (রা) শাসন কালে একদল ছাহাবী আল-কুরআনের সংকলন তৈরির কাজে নিযুক্ত হন।

উবাই ইবনু কা'ব (রা) ছিলেন তাঁদের প্রধান।

উক্ত ছাহাবীদের মাজলিসে তিনি আল-কুরআনের শব্দগুলো উচ্চারণ করতেন।

অন্যরা লিখতেন।

উবাই ইবনু কা'ব (রা) আল-কুরআনের গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে তিনি ফাতওয়া দেয়ার দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর আল-কুরআন পাঠ ছিলো হৃদয়গ্রাহী।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ছালাতুত তারাবীহ্ জামা'আতে আদায়ের নিয়ম চালু করেন।

মাসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত ছালাতুত তারাবীহর ইমাম নিযুক্ত হন উবাই ইবনু কা'ব (রা)।

উবাই ইবনু কা'ব (রা) একদিকে আল-কুরআনের কিরাআত, অন্যদিকে এর মর্মকথা লোকদেরকে শেখাতেন।

দূর দূরান্ত থেকে বহু লোক তাঁর দারস শুনার জন্য আসতেন।

আল-কুরআনের জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে উবাই ইবনু কা'ব (রা) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

যায়িদ ইবনু সাবিতের (রা)
আল-কুরআন চর্চা

যায়িদ (রা) ছিলেন ইয়াসরিবের (আল মাদীনার) বানু নাজজারের এক কৃতী সন্তান।

মুস'আব ইবনু উমাইর (রা) ইয়াসরিব বাসীদের ঘরে ঘরে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছাতে থাকেন।

দশ বছরের মেধাবী বালক যায়িদ (রা) ইসলামের মর্ম কথা উপলব্ধি করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আল-মাদীনায় হিজরাত করে আসেন তখন যায়িদের বয়স মাত্র এগার বছর।

এই অল্প বয়সেই তিনি আল-কুরআনের সতরটি সূরা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরাত করে এলে তাকে জানানো হয় যে এই ছেলেটি সতরটি সূরা মুখস্থ করেছেন।

তিনি খুব খুশি হন।

উবাই ইবনু কা'বের (রা) মতো যায়িদ ইবনু সাবিতও (রা) কাতিবে ওহী নিযুক্ত হন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যেই কয়জন আনছার ছাহাবী পুরো আল-কুরআন মুখস্থ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।

আল্লাহর রাসূলের (সা) নির্দেশে মেধাবী যুবক যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) ইবরানী ভাষা এবং সুরিয়ানী ভাষা শেখেন।

ঐ দুই ভাষায় যেইসব চিঠি আল্লাহর রাসূলের (সা) নিকট আসতো যায়িদ (রা) তাঁকে পড়ে শুনাতেন।

যায়িদ (রা) ইলমুল কিরাআতেও পারদর্শী ছিলেন।
আল-কুরআনের মর্মকথা বুঝার ক্ষেত্রেও তিনি প্রথম সারির ছাহাবীদের একজন ছিলেন।
আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) যেই কয়জন ব্যক্তিকে আল-কুরআন সংকলনের জন্য বাছাই করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।
বরং সংকলন লিপিবদ্ধ করার কাজটি প্রধানত তিনিই করেন।

তিনি আল-কুরআনের দারস দিতেন।
বহু লোক তাঁর দারসের মাজলিসে সমবেত হতেন।
তিনি ইন্তিকাল করলে সালেম ইবনু আবদিল্লাহ্ বলেন, "আজ জনগণের শিক্ষক মারা গেলেন।"

মু'য়ায ইবনু জাবালের (রা) আল-কুরআন চর্চা

নবুওয়াতের দ্বাদশ সনে মুস'আব ইবনু উমাইর (রা) ইয়াসরিবে এসে ব্যাপকভাবে আদ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ্-র কাজ চালাতে থাকেন।
তাঁর কাছে ইসলাম সম্পর্কে অবগত হয়ে মু'য়ায ইবনু জাবাল (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।
তখন তাঁর বয়স আঠার বছর।

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ সনে অনুষ্ঠিত বাই'আতে আকাবায় তিনিও অংশগ্রহণ করেন।
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যেই কয়জন আনছার ছাহাবী পুরো আল-কুরআন মুখস্থ করেন মু'য়ায ইবনু জাবাল (রা) ছিলেন তাঁদের একজন।
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় বানু সালামা মহল্লায় একটি মাসজিদ নির্মিত হয়।
মু'য়ায ইবনু জাবাল (রা) সেই মাসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন।

মু'য়ায ইবনু জাবাল (রা) অত্যন্ত সুমিষ্ট কণ্ঠে আল-কুরআন পড়তেন।
আল-কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানেও তাঁর স্থান ছিলো উঁচুতে।

হিজরী অষ্টম সনে মাক্কা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।
আল-মাদীনায় ফিরে যাবার কালে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মাক্কাবাসীকে আল-কুরআনের জ্ঞান-সমৃদ্ধ করার জন্য মু'য়ায ইবনু জাবালকে (রা) রেখে যান।
হিজরী নবম সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মু'য়ায ইবনু জাবালকে (রা) ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন।
প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি তিনি লোকদেরকে আল-কুরআন শিক্ষা দিতেন।

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে তিনি ফিলিস্তিনবাসীদেরকে আল-কুরআন শিক্ষা দেবার জন্য প্রেরিত হন।
মাঝেমধ্যে তিনি হিম্‌স্‌ ও দিমাসকে গিয়েও আল-কুরআনের দারস পেশ করতেন।
তাঁর শিক্ষা মাজলিসে বহুসংখ্যক লোক সমবেত হতেন।

আবু মূসা আল আশ'য়ারীর (রা) আল-কুরআন চর্চা

আলকুরআনের সাথে আবু মূসা আবদুল্লাহ আল আশ'য়ারীর (রা) ছিলো গভীর সম্পর্ক।

রাত-দিনের বিভিন্ন সময়ে তিনি আল-কুরআন অধ্যয়ন করতেন।

একবার মুয়াজ ইবনু জাবাল (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কিভাবে আল-কুরআন অধ্যয়ন করেন?"

জওয়াবে তিনি বলেন, "আমি বসে, দাঁড়িয়ে, সওয়ারীর ওপর চলা অবস্থায় থেমে থেমে আল-কুরআন অধ্যয়ন করি।"

অর্থাৎ যেই কোন সুযোগে তিনি আল-কুরআন অধ্যয়ন করতেন।

তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিলো সুমধুর।

আবু মূসা আবদুল্লাহ আল আশ'য়ারী (রা) ছিলেন জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার।

তিনি মনে করতেন যে, যতোটুকু তিনি জানেন ততোটুকু অন্যদেরকে জানানো তাঁর জন্য ফারয।

এক ভাষণে তিনি বলেন, "যেই ব্যক্তিকে আল্লাহ ইলম দান করেছেন, তার উচিত অন্য ভাইদের নিকট তা পৌঁছানো। তবে যেই বিষয়ে তার জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করা তার উচিত নয়।"

আল-কুরআনের জ্ঞান মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি নিয়মিত দারস দিতেন।

কখনো কখনো লোকদেরকে জড়ো করে তাদের সামনে ভাষণ দিতেন।

কোথাও যাবার কালে পথিমধ্যে কিছু লোকের সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাদেরকে আল্লাহর রাসূলের (সা) দুই চারটি হাদীস শুনিয়ে দিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনু উমারের (রা) আল-কুরআন চর্চা

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) ছিলেন আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) সুযোগ্য সন্তান।
হিজরাতের সনে তাঁর বয়স ছিলো মাত্র দশ বছর।
ছোট বেলাতেই আল-কুরআনের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
তিনি পুরো আল-কুরআন মুখস্থ করেন।

আল-কুরআনের প্রতিটি আয়াতের তাৎপর্য বুঝার জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন।
শুধু সূরা আল বাকারার ওপরই তিনি গবেষণা করেন চৌদ্দ বছর।

তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি কাজ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতেন।
প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগের সাথে শুনতেন।
তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ১৬৩০ টি হাদীস মুখস্থ করেন।

আল-কুরআনের জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন।
শব্দের কোনরূপ হেরফের না করেই তিনি অন্যদের নিকট আলহাদীস বর্ণনা করতেন।
বহু সংখ্যক ছাত্র তাঁর কাছ থেকে আল-কুরআন ও আল-হাদীস শিখেছেন।

আবুদ্ দারদা উয়াইমির আল আনছারীর (রা) আল-কুরআন চর্চা

আবুদ্ দারদা উয়াইমির (রা) ছিলেন বানু খাযরাজের এক কৃতি সন্তান।
হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
তিনি অল্প সময়ের মধ্যে আল-কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন।
লোকদের মাঝে আল-কুরআনের জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে তিনি আল-মাদীনা ত্যাগ করে সিরিয়া যাবার সংকল্প ব্যক্ত করেন।
সফরের প্রস্তুতি নিয়ে তিনি উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) নিকট আসেন।
উমার (রা) তাঁকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার শর্তে অনুমতি দেবেন বলে জানান।
কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় কোন পদ গ্রহণ করতে রাজি হলেন না।
তবে তিনি জানালেন, তিনি সিরিয়া গিয়ে লোকদেরকে আল-কুরআন ও আল-হাদীস শেখাবেন।
এই কথায় উমার (রা) তাঁকে সিরিয়া যাবার অনুমতি দেন।
যথাসময়ে তিনি দিমাশক পৌঁছেন।
আবুদ্ দারদা উয়াইমির (রা) ছিলেন ঐ সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন যাঁরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় পুরো আল কুরআন মুখস্থ করেন।
তিনি লোকদেরকে কিরাআত শেখাতেন।
তিনি আল-কুরআন ও আল-হাদীসের দারস দিতেন।
দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা এসে তাঁর দারস শুনতেন।

দিমাশকের জামে মাসজিদে তিনি প্রতিদিন ছালাতুল ফাজরের পর বসতেন।
শিক্ষার্থীরা বসতেন তাঁকে ঘিরে।
তাঁরা বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন।
আবুদ্ দারদা (রা) জ্ঞান-গর্ভ জওয়াব দিয়ে তাঁদেরকে তৃপ্ত করতেন।

উবাদা ইবনুস সামিতের (রা) আল-কুরআন চর্চা

উবাদা ইবনুস সামিত (রা) ছিলেন ইয়াসরিবের বানু খাযরাজের বানু সালিম শাখার সন্তান।

নবুওয়াতে একাদশ সনে মিনার নিকটবর্তী আকাবাতে যেই ছয় জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।

ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি আল-কুরআনের বাণীগুলো আয়ত্ব করার জন্য চেষ্টিত হন।

তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ব্যক্তি।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যেই কয়জন আনছার পুরো আল-কুরআন মুখস্থ করেন তিনি ছিলেন তাঁদেরও একজন।

তিনি ইলমুল কিরআতেও পারদর্শী ছিলেন।

সুন্দর কণ্ঠে আল-কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

মাসজিদে নববী সংলগ্ন আছ ছুফফাহ ছিলো বর্তমানকালের আবাসিক স্কুলের মতো।

উবাদা ইবনুস সামিত (রা) ছিলেন এর ব্যবস্থাপক।

এখানে অবস্থানকারীদেরকে বলা হতো আছহাবুছ ছুফফাহ।

তাঁদেরকে আল-কুরআনের পঠন ও লিখন শেখানো হতো।

এই ক্ষেত্রে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বড়ো রকমের অবদান রাখেন।

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে তিনি আল-কুরআনের মু'আল্লিম হিসেবে সিরিয়ায় প্রেরিত হন।

বহু লোক তাঁর নিকট থেকে আল-কুরআনের জ্ঞান হাছিল করেন।
যেখানেই তিনি অবস্থান করতেন সেখানেই আল-কুরআন ও আল-হাদীসের জ্ঞান বিতরণ করতে থাকতেন।

উবাদা ইবনুস সামিত (রা) ছিলেন খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক।
তিনি ছিলেন খুবই স্পষ্টবাদী।
কোথাও আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর খেলাফ কিছু দেখলে লোকমা দিতেন।
আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বিধায় লোকেরা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অভিমতকে খুবই গুরুত্ব দিতেন।

উসাইদ ইবনু হুদাইরের (রা) আল-কুরআন চর্চা

উসাইদ ইবনু হুদাইর (রা) ছিলেন ইয়াসরিবের বানু আউসের বানু আবদিল আশহাল শাখার সন্তান।
প্রথমে তিনি ইসলাম বিরোধী ছিলেন।
একদিন মুস'আব ইবনু উমাইর (রা) বানু জুফারের একটি বাগানে মুসলিমদেরকে আল-কুরআনের তালিম দিচ্ছিলেন।
স্থানটি ছিলো বানু আবদিল আশহালের কাছাকাছি।
খবর পেয়ে উসাইদ (রা) সেই বাগানে আসেন।
তিনি রাগত স্বরে মুস'আবকে (রা) বলেন, "ভালো চাইলে এখখুনি এখান থেকে চলে যাও।"
হাসিমাখা মুখে মিষ্ট ভাষায় মুস'আব ইবনু উমাইর (রা) বললেন, "আপনি বসুন। আমার কথা একটু শুনুন। ভালো লাগলে গ্রহণ করবেন। তা না হলে আমি চলে যাবো।"
মুস'আব ইবনু উমাইরের (রা) আচরণ তাঁর ভালো লাগলো।
তিনি কাছে এসে বসে পড়েন।
মুস'আব (রা) আল-কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন।
সুমধুর কণ্ঠে আয়াতের পর আয়াত পড়তে থাকেন।
এই দিকে উসাইদের চেহারাও পরিবর্তিত হতে থাকে।
কিছুক্ষণ পর তিনি বলে ওঠেন, "তোমাদের দীনে কিভাবে দাখিল হতে হয়?"
মুস'আব (রা) এই সম্পর্কে তাঁকে প্রয়োজনীয় কথা জানিয়ে দেন।
উসাইদ (রা) ওঠে চলে যান।
বাড়িতে গিয়ে গোসল করে পাক-সাফ পোষাক পরে তিনি ফিরে আসেন।
মুস'আব ইবু উমাইরের (রা) হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এবার তিনি আল-কুরআন শেখার সাধনায় লেগে যান।
তিনি মধুর কণ্ঠে আল কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

একদিন রাতে তিনি নিবিষ্ট মনে আল-কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন।
বাইরে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিলো।
পাশেই মাদুরের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া।
এক সময় ঘোড়াটি অস্থির হয়ে ওঠে।
তিনি আশংকা করলেন, ঘোড়াটি তাঁর ঘুমিয়ে থাকা ছেলের ওপর পা মারতে পারে।
তিনি আল-কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে বাইরে আসেন।
আকাশের দিকে তাকিয়ে আলোর ঝালরের মতো একটা কিছু দেখতে পান।
সকালে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন।

আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "একদল ফিরিশতা তোমার তিলাওয়াত শুনতে এসেছিলেন।
তুমি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে থাকলে লোকেরা তাঁদেরকে দিনের আলোতে দেখতে পেতো।"

পুণ্যবান ব্যক্তিদের কণ্ঠে আল-কুরআনের তিলাওয়াত শুনার জন্য আসমান থেকে ফিরিশতা নেমে আসেন।
উসাইদ ইবনু হুদাইরের (রা) নিকটে আগত ফিরিশতাদেরকে দৃশ্যমান করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

উসাইদ (রা) আল-কুরআন ও আল-হাদীসের জ্ঞান লোকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও বড়ো রকমের অবদান রেখেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাসের (রা) আল-কুরআন চর্চা

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন মাক্কার বানু হাশিমের এক সন্তান।
এই গোত্রের বেশিরভাগ লোক তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি।
কিন্তু তারা চাইতো না যে তাদের গোত্রের এই সম্মানিত সন্তানের কোন ক্ষতি হোক।

নবুওয়াতের ষষ্ঠ সন।
বাকি নয় গোত্রের নেতারা বানু হাশিমের নেতা আবু তালিবকে চাপ দিলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) তাদের হাতে তুলে দিতে।
আবু তালিব রাজি হলেন না।
ফলে নয় গোত্রের নেতারা বানু হাশিমের বিরুদ্ধে একটি বয়কট চুক্তি স্বাক্ষর করে।
তারা বানু হাশিমের সাথে লেনদেন, বেচা-কেনা ও বিয়ে-শাদি বন্ধ করে দেয়।
বানু হাশিম একটি গিরিসংকটে সমবেতভাবে বসবাস শুরু করে।
এখানে তাদেরকে কাটাতে হয় তিনটি বছর।
এখানে অবস্থানকালেই আবু তালিবের ভাই আল আব্বাসের একপুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।
এই সন্তানই আব্দুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা)।
কয়েক বছর পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াসরিবে হিজরাত করেন।
গড়ে তোলেন আল-মাদীনা রাষ্ট্র।

হিজরী অষ্টম সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক মাক্কা বিজয়ের কিছু আগে আব্বা-আম্মার সাথে আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) আল-মাদীনায় হিজরাত করেন।

তখন তাঁর বয়স এগারো বছর।
আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) ছিলেন খুবই মেধাবী তরুণ।
তিনি আল-কুরআন মুখস্থ করেন।
ইলমুল কিরাআতে পারদর্শিতা অর্জন করেন।
তাছাড়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) ১৬৬০টি হাদীস স্মৃতিতে ধারণ করেন।
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স মাত্র তেরো বছর।

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে তিনি যৌবনে পৌঁছেন।
কমবয়সী হলেও আল-কুরআন ও আল-হাদীসের জ্ঞানে পরিপক্কতা অর্জন করায় উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বিভিন্ন সময় পরামর্শের জন্য প্রবীণ ছাহাবীদের সাথে তাঁকেও ডাকতেন।

পরিণত বয়সে তিনি একজন বিজ্ঞ শিক্ষাবিদরূপে ভূমিকা পালন করেন।
তাঁর বাসস্থান একটি শিক্ষালয়ে পরিণত হয়।
প্রতিদিন বহুসংখ্যক লোক তাঁর বাড়ির আংগিনায় জড়ো হতেন।
তাঁরা গ্রুপে গ্রুপে যেতেন তাঁর ঘরে।
তিনি তাঁদেরকে আল-কুরআন, আল-হাদীস, আল-ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।
লোকেরা তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হতেন।
অগণিত মানুষের কাছে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাসের (রা) অবদান খুবই বড়ো।

আছহাবে
রাসূলের
আত্ম-ত্যাগ

আবু তালহা যায়িদ ইবনু সাহল আল আনছারীর (রা) আত্ম-ত্যাগ

আবু তালহা যায়িদ (রা) ছিলেন বানু খাযরাজের বানু নাজজার শাখার সন্তান।

বানু নাজজারের এক কন্যা সন্তান ছিলেন উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান।

তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বিধায় তাঁর স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করে ইয়াসরিব ছেড়ে চলে যায়।

এই উম্মু সুলাইমেরই পুত্র ছিলেন আনাস ইবনু মালিক (রা)।

আবু তালহা যায়িদ উম্মু সুলাইমকে (রা) বিয়ে করতে চান।

উম্মু সুলাইম (রা) জানান যে আবু তালহা (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেই তা হওয়া সম্ভব।

আবু তালহা (রা) কিছুদিন চিন্তা-ভাবনা করেন।

অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করেন।

অতপর তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

খৃস্টীয় ৬২২ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াসরিবে হিজরাত করেন।

অতপর ইয়াসরিবের নাম হয় আল মাদীনা।

আল-মাদীনা একটি রাষ্ট্রের রূপ নেয়।

প্রথম রাষ্ট্র প্রধান হন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)।

হিজরী দ্বিতীয় সনে মাক্কার মুশরিক বাহিনী আল-মাদীনা আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়।

মুকাবিলা হয় বদর প্রান্তরে।

আল্লাহর সাহায্যে ৩১৩ জন মুসলিম ১ হাজার যোদ্ধা বিশিষ্ট মুশরিক বাহিনীকে পরাজিত করেন।

বদর যুদ্ধের পর সূরা আলে ইমরানের যেই যেই অংশ নাযিল হয় তারই একাংশে রয়েছে ৯২ নাম্বার আয়াতটি।

এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

"লান তানা-লুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন। ওয়া মা তুনফিকু মিন্ শাইয়িন ফা-ইন্নাল্লাহা বিহী আলীম।"

[তোমরা পুণ্য পেতে পারো না যেই পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় কর। আর তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর না কেন সেই সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই অবগত।]

এই আয়াতের নিরিখে আবু তালহা যায়িদ ইবনু সাহল (রা) ভাবতে থাকেন তাঁর প্রিয় বস্তু কোনটি?

"বী'রেহা" নামক তাঁর একটি চমৎকার বাগান ছিলো।

তাঁর মন বলে ওঠলো, ওটাই তাঁর প্রিয় বস্তু।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ওই প্রিয় বাগানটি তিনি আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য দান করবেন।

আবু তালহা যায়িদ ইবনু সাহল (রা) আল্লাহর রাসূলের (সা) কাছে আসেন এবং তাঁর অতি প্রিয় বী'রেহা নামক বাগানটি আল্লাহর পথে দান করার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

আল্লাহর রাসূল (সা) বাগানটি তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দিতে বলেন।

আবু তালহা (রা) বণ্টনের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহর রাসূলকে (সা) অনুরোধ জানান। আল্লাহর রাসূল (সা) আবু তালহার (রা) অনুরোধ রক্ষা করেন এবং তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে বাগানটি ভাগ করে দেন।

কী চমৎকার আত্ম-ত্যাগের উদাহরণ স্থাপন করলেন আবু তালহা যায়িদ আল আনছারী (রা)!

আবুদ্ দাহ্দাহ্ সাবিত আল আনছারীর (রা) আত্ম-ত্যাগ

আবুদ্ দাহ্দাহ্ সাবিত আল আনছারী (রা) ছিলেন ইয়াসরিবের বানু বাল্লীর বানু আজলান শাখার সন্তান।

এই গোত্রটি বানু আমর ইবনু আউসের মিত্র ছিলো।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) হিজরাত করে আসার পর ইয়াসরিববাসীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করার হিড়িক পড়ে যায়।

আবুদ্ দাহ্দাহ্ সাবিত (রা) এই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

উহুদ যুদ্ধে তিনি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আল্লাহর রাসূল (সা) নিহত হয়েছেন বলে গুজব ছড়িয়ে পড়লে মুসলিমদের মধ্যে একটু স্থিমিত ভাব এসে যায়।

এই সময় যাঁরা দৃঢ়পদ ছিলেন আবুদ্ দাহ্দাহ্ সাবিত (রা) ছিলেন তাঁদের একজন।

সেই সময় তিনি উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকেন, "আনছারগণ, এগিয়ে আস। আল্লাহর রাসূল যদি শহীদ হয়ে গিয়েই থাকেন, আল্লাহ্ তো জীবিত আছেন এবং চিরকাল জীবিত থাকবেন।

তোমাদের ওপর ফারয হলো দীনের জন্য লড়াই করা।

আল্লাহ্ সাহায্য ও বিজয়দানকারী।"

হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্ববর্তী কোন এক সময় নাযিল হয় সূরা আল-হাদীদ।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন প্রধানত ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ'র গুরুত্বের প্রতি মুমিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এই সূরার ১১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন, "মান্ যাল্লাযী ইউকরিদুল্লাহা কারদান হাসানান ফা-ইউদা'য়িফাহূ লাহূ ওয়া লাহূ আজরুন কারীম।"

[এমন কে আছে যে আল্লাহকে করজে হাসানা দেবে যা তিনি বহু গুণ বাড়িয়ে তাকে ফেরত দেবেন? আর সেই ব্যক্তির জন্য রয়েছে অতীব উত্তম প্রতিদান।]

এই আয়াতের কথা মুমিনদের মধ্যে বেশ চর্চা হচ্ছিলো।

কে কিভাবে আল্লাহর এই সুন্দর আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন, তা তাঁরা ভাবছিলেন।

এক সময় এই আয়াত নাযিলের কথা পৌঁছলো আবুদ্ দাহদাহ সাবিত আল আনছারীর (রা) কানে।

কী চমৎকার কথা!

অবশ্যই তাঁকে সাড়া দিতে হবে আল্লাহর আহ্বানে।

তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ কি আমাদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন?"

তিনি বললেন, "হাঁ, হে আবুদ্ দাহদাহ।"

তিনি বললেন, "আপনার হাতটা একটু আমাকে দিন।"

নবী (সা) হাত বাড়িয়ে দেন।

আবুদ্ দাহদাহ সেই হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, "আমি আমার বাগানটি আমার রবকে ঋণ দিলাম।"

সেই বাগানে ছিলো ছয়শত খেজুর গাছ।

বাগানের মধ্যেই ছিলো আবুদ্ দাহদাহর (রা) বাড়ি যেখানে তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের নিয়ে বাস করতেন।

তিনি বাড়িতে গিয়ে বললেন, "উম্মুদ দাহদাহ, এই বাগান আমি আমার রবকে ঋণ হিসাবে দিয়ে দিয়েছি।"

উম্মুদ দাহদাহ বললেন, "আপনি লাভজনক ব্যবসাই করেছেন।"

যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী।

অতপর তাঁরা তাঁদের আসবাবপত্র বের করে সেই বাগান-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিকের (রা)
আত্ম-ত্যাগ

আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) ছিলেন মাক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের একজন।
ব্যবসাতে তিনি সফলতাও অর্জন করেন।
ইসলাম গ্রহণ করার পর ব্যবসাতে তেমন সময় দিতে পারতেন না।
সঞ্চিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করতে থাকেন নির্যাতিত মুসলিমদের কল্যাণে।

খৃস্টীয় ৬২২ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সফর সংগী রূপে তিনি ইয়াসরিবে হিজরাত করেন।
নতুন কর্মস্থলে গিয়েও অর্থোপার্জনের জন্য তিনি ব্যবসা শুরু করেন।
এখানেও আদ্ দাওয়াত ও আল জিহাদের প্রয়োজনে তিনি অকাতরে অর্থ দান করতে থাকেন।

হিজরী নবম সন।
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আল-মাদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান।
সিরিয়া-ফিলিস্তিন তখন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ।
পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের কাইজার হিরাক্লিয়াস বিশাল সেনা বাহিনী নিয়ে আল-মাদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সিরিয়া সীমান্তে প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন।
তাঁর মুকাবিলার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে বলেন।
গড়ে ওঠে ত্রিশ হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী।

এই বাহিনী মরুভূমির এবড়োথেবড়ো পথে বহু দূর যেতে হবে।

পৌঁছুতে হবে তাবুক।

চাই উট, ঘোড়া এবং হাতিয়ার।

সাথে নিতে হবে প্রচুর পানি ও খাদ্য।

অথচ এইসব সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন অনেক অর্থের।

আল্লাহর রাসূল (সা) লোকদের প্রতি ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর আহ্বান জানান।

আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) বাড়িতে যান।

সব অর্থ-সম্পদ একত্রিত করেন।

অতপর আল্লাহর রাসূলের (সা) নিকট এসে সেইসব অর্থ-সম্পদ তাঁর হাতে তুলে দেন।

আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "পরিবার পরিজনের জন্য কিছু রেখেছো কি?"

জওয়াবে তিনি বলেন, "আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই তাদের জন্য যথেষ্ট।"

এটি আত্ম-ত্যাগের অতি উজ্জ্বল একটি উদাহরণ।

উসমান ইবনু আফফানের (রা)
আত্ম-ত্যাগ

মাক্কার জীবনে উসমান (রা) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।
আল-মাদীনাতে হিজরাত করে এসে ব্যবসা শুরু করেন।
আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর ব্যবসাতে বিপুল সমৃদ্ধি দান করেন।
ফলে তিনি বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিক হন।

এটা সত্য যে তুলনামূলকভাবে উসমান (রা) ভালো খাবার খেতেন।
ভালো পোষাক পরতেন।
এর অর্থ এই নয় যে তিনি বিলাসী জীবন যাপন করতেন।
তাঁর জীবনে কোন জাঁকজমক ছিলো না।
তিনি ভোগবাদী ছিলেন না।

উসমান (রা) তাঁর উপার্জিত অর্থ বিত্তহীনদের মধ্যে অকাতরে বিতরণ করতেন।
জনহিতকর কাজে তিনি মোটা অংকের টাকা ব্যয় করতেন।

সেই সময় আল মাদীনাত বিশুদ্ধ পানির বড্ড সংকট ছিলো।
রুমা নামক কূপের পানি ছিলো পানের উপযোগী।
এটির মালিক ছিলো এক ইয়াহুদী।
সে বিনা পয়সায় কাউকে পানি নিতে দিতো না।
উসমান (রা) আঠার হাজার দিরহামের বিনিময়ে কূপটি কিনে নেন এবং সর্ব সাধারণের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।

গোড়ার দিকে মাসজিদে নববী ছিলো বেশ ছোট।
মুসলিমদের সংখ্যা বেড়েই চলছিলো।

ফলে মাসজিদে লোকদের ঠাঁই হতো না।
উসমান (রা) মাসজিদ সংলগ্ন জমি চড়া মূল্যে ক্রয় করে মাসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন।

হিজরী নবম সনে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) সিরিয়া সীমান্তে খৃস্টান রোমানদের মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হন।
ত্রিশ হাজার মুজাহিদ তাঁর সংগী হন।
উসমান (রা) এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ দশ হাজার মুজাহিদের যাবতীয় খরচ বহন করেন।

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাহাদাতের পর তিনি আল-মাদীনা রাষ্ট্রের আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত হন।
ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য তিনি বাইতুলমাল থেকে কোন অর্থ নিতেন না।
তাঁর জন্য একটি ভাতা নির্ধারিত ছিলো।
সেই অর্থ তুলে তিনি জনগণের মধ্যে বিলি করে দিতেন।

আবু মুহাম্মাদ তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহর (রা)
আত্ম-ত্যাগ

তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ করার পর মাক্কাতে তাঁর ব্যবসা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হিজরাত করে মাদীনায় এসে তিনি আবার ব্যবসা শুরু করেন।

ব্যবসাতে সফলতাও অর্জন করেন।

আর ব্যবসালব্ধ অর্থ তিনি অকাতরে দান করতেন।

একবার হাদরামাউত থেকে মুনাফা রূপে তাঁর কাছে আসে সত্তর হাজার দিরহাম।

রাতে তিনি বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকেন।

তাঁর স্ত্রী উম্মু কুলসুম বিনতু আবী বাকর (রা) জিজ্ঞেস করেন, "আপনার কী হয়েছে? আমার কোন আচরণে আপনি কী কষ্ট পেয়েছেন?"

তালহা (রা) বললেন, "না, একজন মুসলিমের স্ত্রী হিসেবে তুমি খুবই উত্তম। কিন্তু সেই সন্ধা থেকে আমি ভাবছি, এতোগুলো দিরহাম ঘরে রেখে ঘুমুলে একজন মানুষের তার রবের প্রতি কি ধারণা পোষণ করা হয়?"

তাঁর স্ত্রী বললেন, "এতো চিন্তিত হওয়ার কি আছে?

এতো রাতে আপনি গরীব মিসকীন পাবেন কোথায়?

সকাল হলেই বন্টন করে দেবেন।"

তালহা (রা) বললেন, "আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন।

তুমি তোমার আব্বার যোগ্য কন্যাই বটে।"

'তালহা (রা) স্ত্রীর কথায় শান্ত হন।'

স্বচ্ছন্দে রাতটি কাটিয়ে দেন।

ভোর না হতেই অনেকগুলো থলে এনে তিনি দিরহামগুলো ভাগ করে গরীব মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দেন।

তালহা (রা) সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন।

বড়ো মাপের ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর জীবনে বিলাসিতার ছোঁয়া লাগতে দেননি।

তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা) ছিলেন আত্ম-ত্যাগী মানুষদের প্রথম সারির একজন।

আবদুর রাহ্মান ইবনু আউফের (রা)
আত্ম-ত্যাগ

একবার আল-মাদীনায় হৈ চৈ পড়ে গেলো।

সাতশত উটের বিশাল কাফিলা এসেছে।

প্রতিটি উটের পিঠে খাদ্য শস্যের অনেকগুলো বস্তা।

আয়িশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "এই বাণিজ্য কাফিলা কার?"

লোকেরা বললো, "আবদুর রাহ্মান ইবনু আউফের।"

আয়িশা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, "আমি যেন আবদুর রাহ্মানকে পুলছিরাতের ওপর একবার হেলে গিয়ে আবার সোজা হয়ে উঠতে দেখলাম।"

আয়িশার (রা) এই কথাগুলো আবদুর রাহ্মানের (রা) কানে গেলো।

তিনি বললেন, "ইনশাআল্লাহ, আবদুর রাহ্মান সোজা হয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

এই বলে তিনি তাঁর লোকদের নির্দেশ দেন।

তারা সাতশত উটের পিঠে বোঝাই সব খাদ্যশস্য লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়।

কেউ কেউ বলেন, আবদুর রাহ্মান বস্তা বহনকারী সেই সাতশত উটও দান করে দেন।

এটি আত্ম-ত্যাগের কতোই না উজ্জ্বল উদাহরণ!

হারিস (রা) ও ইকরিমার (রা)
আত্ম-ত্যাগ

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) শাসনকালেই খৃস্টান রোমানরা মুসলিমদের সাথে শত্রুতা শুরু করে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর তাদের শত্রুতার মাত্রা বেড়ে যায়।

আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিকের (রা) শাসনকালে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার বহু জনপদ থেকে রোমানদেরকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

রোমানরা বিশাল সেনাবাহিনী সংগঠিত করে সিরিয়ার অন্তর্গত ইয়ারমুক উপত্যকায় মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

এই যুদ্ধে এক লাখ বিশ হাজার খৃস্টান রোমানদের মুকাবিলা করেন মাত্র ছাব্বিশ হাজার মুসলিম।

যুদ্ধ চলাকালেই আল-মাদীনায় আবু বাকর আছ ছিদ্দিক (রা) ইন্তিকাল করেন।

আমীরুল মুমিনীন হন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)।

বিপুল সংখ্যক রোমান সৈন্য মুসলিমদের হাতে নিহত হয়।

যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয়ী হন।

তবে বেশ কিছু নামীদামী মুসলিমও এই যুদ্ধে শহীদ হন।

যুদ্ধে আহত হয়ে ময়দানে পাশাপাশি পড়ে ছিলেন তিন মুসলিম বীর ঃ হারিস ইবনু হিশাম, ইকরিমা ইবনু আবী জাহাল এবং আইয়াশ ইবনু আবী রাবীয়া (রা)।

জখম থেকে অনবরত রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে।

তাঁরা নিস্তেজ হয়ে পড়েন।

বাঁচার কোন আশাই ছিলো না।

"পানি, পানি" বলে চিৎকার করছিলেন হারিস ইবনু হিশাম (রা)।
একজন মুসলিম সৈনিক এক পেয়ালা পানি নিয়ে ছুটে আসেন তাঁর কাছে।
তিনি পানি পান করতে যাবেন, এমন সময় দেখেন ইকরিমা (রা) তাকিয়ে আছেন পেয়ালার দিকে।
হারিস ইবনু হিশাম (রা) পেয়ালাধারী সৈনিককে বললেন, "আগে ইকরিমাকে পানি পান করাও।"
সৈনিকটি পেয়ালা হাতে ছুটে আসেন তাঁর কাছে।
ইকরিমা পানি পান করতে যাবেন, এমন সময় দেখতে পান আইয়াশ ইবনু আবী রাবীয়া (রা) তাকিয়ে আছেন পেয়ালার দিকে।
ইকরিমা (রা) বললেন, "আগে আইয়াশকে পানি পান করাও।"
পেয়ালা হাতে সৈনিকটি আইয়াশ ইবনু আবী রাবীয়ার (রা) কাছে পৌঁছার আগেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।
সৈনিকটি পেয়ালা হাতে ছুটে আসেন ইকরিমার (রা) কাছে।
দেখেন ইকরিমা (রা) শহীদ হয়ে গেছেন।
এবার পেয়ালা নিয়ে সৈনিকটি ছুটে আসেন হারিস ইবনু হিশামের (রা) কাছে।
দেখেন, তিনিও আর বেঁচে নেই।

ইন্তিকালের পূর্বে প্রচণ্ড পিপাসায় ছটফট করাকালেও অপর ভাইয়ের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়।
আছহাবে রাসূল এমন কঠিন মুহূর্তেও স্থাপন করে গেছেন আত্ম-ত্যাগের অনন্য উদাহরণ।

আছহাবে
রাসূলের
অল্পে তুষ্টি

আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিকের (রা)
অল্পে তুষ্টি

আবু বাকর আবদুল্লাহ আতীক আছ্ ছিদ্দিক (রা) ছিলেন সফল ব্যবসায়ী।
তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর সঞ্চয় ছিলো চল্লিশ হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা)।
ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যেইসব ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী নির্যাতিত হচ্ছিলেন উচ্চমূল্য দিয়ে তিনি তাঁদেরকে কিনে নেন এবং আযাদ করে দেন।
তাঁর সঞ্চিত অর্থের সিংহভাগ এই খাতে ব্যয় হয়।
হিজরাতকালে তাঁর হাতে অবশিষ্ট ছিলো মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম।

আল-মাদীনায় হিজরাত করে আসার পরও তিনি ব্যবসা করতেন।
আয়ের বেশিরভাগ আদ্ দা'ওয়াত এবং আল-জিহাদের কাজে ব্যয় করতেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (রা) ইন্তিকালের পর তিনি আল-মাদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচিত হন।
রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে ব্যবসা চালানো ছিলো সুকঠিন।
তাই উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বিশিষ্ট প্রবীণ ছাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে তাঁর জন্য বাইতুল মাল থেকে একটি ভাতা নির্ধারণ করে দেন।
এই ভাতার পরিমাণ ছিলো বার্ষিক আড়াই হাজার দিরহাম।

আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন।
সাধারণ খাদ্য খেতেন।

পরার জন্য তিনি প্রতি বছর বাইতুল মাল থেকে পেতেন দুই সেট পোষাক।
এতেই তিনি পরিতৃপ্ত ছিলেন।

তাঁর এক খণ্ড জমি ছিলো।
ইন্তিকালের পূর্বে তিনি ওয়াছিয়াত করে যান সেটি বিক্রয় করে বাইতুল মাল থেকে তিনি যেই ভাতা গ্রহণ করেছেন তা যেন পরিশোধ করে দেয়া হয়।
তিনি আরো ওয়াছিয়াত করেন, মৃত্যুর পর তাঁর পরনের কাপড়টি ধুয়ে নিয়ে অন্য দুই টুকরো কাপড় মিলিয়ে যেন তাঁর কাফন দেয়া হয়।

মৃত্যুকালে একজন দাসী এবং দুইটি উটনী ছাড়া তিনি আর কোন সম্পদ রেখে যাননি।

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) অল্পে তুষ্টি

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ছিলেন বানু আদীর এক কৃতী সন্তান।
মাক্কায় অবস্থানকালে তিনি ব্যবসা করতেন।
আল-মাদীনায় হিজরাতের পর তিনি নতুন করে ব্যবসা শুরু করেন।
তবে আদ্ দা'ওয়াত এবং আল-জিহাদের প্রয়োজনে যখনই ডাক পড়তো, উপস্থিত হতেন।

আবু বাকর আছ্ছিদ্দিকের (রা) ইন্তিকালের পর তিনি হন আল-মাদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধান।
যুগপৎ রাষ্ট্র পরিচালনা এবং ব্যবসা চালানো খুবই কঠিন ছিলো।
তথাপিও কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি বাইতুল মাল থেকে ভাতা নিতে রাজি হননি।
রাষ্ট্রীয় কাজের চাপে যখন ব্যবসাতে যথেষ্ট সময় দেয়া সম্ভব হচ্ছিলো না তখন আলী ইবনু আবী তালিব (রা) মাজলিসে শূরার সদস্যদেরকে নিয়ে তাঁকে বাইতুল মাল থেকে ভাতা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন।
তিনি বার্ষিক আটশত দিরহাম ভাতা নিতে সম্মত হন।
হিজরী ১৫ সনে বাইতুল মাল বেশ সমৃদ্ধ হয়।
তখন সকলের ভাতার পরিমাণ বাড়ানো হয়।
এই সময় তাঁর ভাতার পরিমাণ নির্ধারিত হয় বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম।
এটাও বড়ো কোন অংক ছিলো না।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিকের (রা) মতো সাদাসিধে জীবন-যাপন করতেন।
সাধারণ খাবার খেতেন।
কম সংখ্যক পোষাক পরতেন।

আবু লূলূ ফিরোজের ছুরির আঘাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন।
বাঁচার কোন সম্ভাবনাই ছিলো না।
শাহাদাত লাভের পূর্বে তিনি তাঁর সুযোগ্য পুত্র আবদুল্লাহ ইবনু উমারকে (রা) ডেকে ওয়াছিয়াত করেন, তাঁর বাগান বিক্রয় করে যেন বাইতুল মাল থেকে তিনি যেই ভাতা গ্রহণ করেছিলেন তা পরিশোধ করে দেয়া হয়।

আলী ইবনু আবী তালিবের (রা)
অল্পে তুষ্টি

খৃস্টীয় ৬১০ সনে মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন।
তাঁর হাতে প্রথম মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ (রা)।
আর দ্বিতীয় মুসলিম হন আলী ইবনু আবী তালিব (রা)।
তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর।
আলী (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়িতেই থাকতেন।
আল-কুরআন মুখস্থ করতেন।
ইসলামের বিধি-বিধান অবগত হতেন।
আর নিষ্ঠাসহকারে সেইগুলো অনুশীলন করতেন।

খৃস্টীয় ৬২২ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরাত করেন।
তাঁর গৃহে ছিলো বিভিন্ন ব্যক্তির গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ।
সেইগুলো মালিকদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য তিনি আলীকে (রা) রেখে যান।
আলী ইবনু আবী তালিব (রা) সকলকে তাঁদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে আল-মাদীনায় হিজরাত করেন।

আলী (রা) ব্যবসা-বাণিজ্য শেখেননি।
প্রচুর অর্থের প্রয়োজনও তিনি কখনো অনুভব করেননি।
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) অনাড়ম্বর জীবন-যাপন তাঁকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।
তিনি নিজেও সাদাসিধে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন।
আল-মাদীনায় আসার পরও আলী ইবনু আবী তালিব (রা) নবীর (সা) তত্ত্বাবধানেই থাকতেন।
নবীর (সা) গৃহেই পানাহার করতেন।
আর একান্তভাবে নিবেদিত থাকতেন আল-কুরআন ও আল-হাদীস চর্চায়।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের তিনিও একজন।
বদর যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যা ফাতিমার (রা) সংগে তাঁর বিয়ে হয়।
এবার তাঁকে পৃথক ঘর নিতে হয়।
প্রয়োজন দেখা দেয় জীবিকা উপার্জনের।

টুকটাক কাজ করে যা পেতেন তা দিয়েই তিনি সংসার চালাতে থাকেন।
তাঁর স্ত্রী ফাতিমা (রা) সাদাসিধে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।
ফাতিমা (রা) নিজ হাতে যাঁতায় গম পিষতেন।
গমের রুটি বানাতেন ও সেঁকতেন।
কূয়া থেকে নিজে পানি ওঠাতেন।
তাঁদের কোন দাস-দাসী ছিলো না।
আলী ইবনু আবী তালিব (রা) কখনো কখনো যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ পেতেন।
উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনামলে তাঁর জন্য বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারিত হয়।

আলী (রা) ছিলেন খুবই দানশীল।
কেউ সাহায্য চাইলে তিনি তাকে খালি হাতে ফেরাতেন না।
ফলে কখনো কখনো তাঁকে সপরিবারে অভুক্ত থাকতে হতো।

আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত হওয়ার পরও তাঁর জীবনধারা একই রকম ছিলো।
কখনো কখনো তাঁর পরনে ছেঁড়া কাপড় শোভা পেতো।
শাহাদাতকালে তিনি পেছনে রেখে যান নগদ মাত্র সাত শত দিরহাম।

অল্পেতুষ্ট প্রথম সারির মানুষদের তিনি ছিলেন একজন।

আয্‌ যুবাইর ইবনুল আওয়ামের (রা) অল্পে তুষ্টি

আয্‌ যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।
বলা যায়, তাঁর ব্যবসাতে কখনো লোকসান হতো না।
হিজরাত করে আল-মাদীনায় আসার পর ঘোড়ার পিঠেই তাঁর সময় কেটেছে বেশী।
পরবর্তীকালে তিনি নতুনভাবে ব্যবসা সংগঠিত করেন।
তখন তিনি মোটা অংকের মুনাফা পেতে শুরু করেন।

ক্রমান্বয়ে তাঁর দাসের সংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজার।
এরা কায়িক পরিশ্রম করে তাঁর জন্য অর্থ উপার্জন করতো।
এই অর্থের পরিমাণ ছিলো বেশ বড়ো।
কিন্তু আয্‌ যুবাইর (রা) দাসদের দ্বারা উপার্জিত একটি দিরহামও নিজের এবং পরিবার সদস্যদের জন্য ব্যয় করতেন না।
কম বিত্তবান লোকদের মাঝে ঐ অর্থ বিলিয়ে দিতেন।

ব্যবসার মুনাফার একটি অংশ তিনি ভোগ করতেন।
বাকিটা লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন।

প্রভূত অর্থ উপার্জন করেও তিনি বিলাসী জীবন-যাপন করেননি।
তিনি সাদা সিধে জীবন-যাপন করতেন।
সাধারণ খাবার খেতেন।
অনাড়ম্বর পোশাক পরতেন।

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ'র (রা)
অল্পে তুষ্টি

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা) ছিলেন প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন।
তিনিও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।
আল-মাদীনায় এসেও তিনি ব্যবসা করতেন।
কিন্তু আল জিহাদের ময়দানে বারবার ছুটে যেতে হতো বলে ব্যবসার দিকে নজর দিতে পারছিলেন না।
বহুসংখ্যক যুদ্ধে তাঁকে সেনাপতিত্ব করতে হয়।

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে তিনি সিরিয়ার রনাংগণ চষে বেড়ান।
তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী বহুসংখ্যক জনপদ জয় করেন।
যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ তিনিও পেতেন।
তাই তিনি অভাবী ব্যক্তি ছিলেন না।
কিন্তু অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন।
জীবন যাত্রার মান উন্নত করার প্রতি তাঁর কোন আগ্রহই ছিলো না।
তলোয়ার, ঢাল এবং ঘোড়ার পিঠে তাঁর আসন ঠিকঠাক পেলেই তিনি তুষ্ট থাকতেন।

তাঁর বাসস্থানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও নেই দেখে একবার উমার (রা) তাঁর জন্য চারশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এবং চার হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) পাঠান।
এইগুলো তাঁর হাতে পৌছার সংগে সংগেই তিনি তাঁর অধীনস্থ সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।
একটি দীনার কিংবা একটি দিরহামও তিনি নিজের জন্য রাখেননি।

আবদুল্লাহ্ ইবনু উমারের (রা)
অল্পে তুষ্টি

আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা) একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন।
তাঁর কিছু জমি ছিলো যেখানে চাষাবাদ হতো।
ফসল বিক্রয় করে তিনি যথেষ্ট অর্থ পেতেন।
বাইতুল মাল থেকে তিনি ভাতাও পেতেন।
ফলে তিনি বিত্তহীন ছিলেন না।

কিন্তু আয়ের বেশিরভাগ তিনি দান করে দিতেন।
নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য সামান্য কিছু রাখতেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) এবং তাঁর পিতা উমার ইনবুল খাত্তাবের (রা) মতো তিনি সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন।
কম পোষাক পরতেন।
কম খাবার খেতেন।

একবার একব্যক্তি তাঁকে একটি ভরা পাত্র দেয়।
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এটি কী?"
লোকটি বললো, "ঔষধ। এটি আমি ইরাক থেকে আপনার জন্য এনেছি।"
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এর গুণ কী?"
লোকটি বললো, "এটি হজম শক্তি বৃদ্ধি করে।"
তিনি হেসে ওঠে বলেন, "চল্লিশ বছর ধরে তো আমি পেট পূরেই খাই না।"

অসাধারণ অল্পে তুষ্ট মানুষদের তিনি ছিলেন একজন।

সায়ীদ ইবনু আমের আল জুমাহীর (রা)
অল্পে তুষ্টি

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে সায়ীদ ইবনু আমের আল জুমাহী (রা) হিম্‌স নামক স্থানের গভর্নর নিযুক্ত হন।

একবার হিম্‌স থেকে কিছুসংখ্যক লোক আসেন আল মাদীনাতে। তাঁরা আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) সাথে সাক্ষাত করেন।

আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে আমীরুল মুমিনীন তাঁদেরকে হিম্‌সের দরিদ্র মানুষদের একটি তালিকা তৈরি করে দিতে বলেন যাতে তিনি তাদের জন্য কিছু সাহায্য বরাদ্দ করতে পারেন।
তাঁরা পরস্পর মত বিনিময় করে একটি তালিকা তৈরি করে আমীরুল মুমিনীনের হাতে দেন।

তালিকায় প্রথম নামটি ছিলো সায়ীদ ইবনু আমের আল জুমাহীর (রা)।
তালিকা পড়তে গিয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) 'সায়ীদ' নামটি দেখে জিজ্ঞেস করেন, "এই সায়ীদ ইবনু আমের কে?"
তাঁরা বললেন, "তিনি আমাদের আমীর।"
উমার (রা) বললেন, "তোমাদের আমীরও কি দরিদ্র?"
তাঁরা বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম, একাধারে কয়েকদিন তাঁর বাড়িতে চুলার ওপর পাতিল বসে না।"
তাঁদের জওয়াব শুনে উমার (রা) কেঁদে ফেলেন।
চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যায়।

অতপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সায়ীদ ইবনু আমের আল জুমাহীর (রা) জন্য এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বরাদ্দ করেন এবং একটি

থলেতে ভরে হিম্‌স থেকে আগত ব্যক্তিদের মাধ্যমে সেইগুলো তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন।

হিম্‌সবাসীরা হিম্‌সে ফিরে গিয়ে যথাসময়ে দীনার ভর্তি থলেটি সায়ীদ ইবনু আমের আল জুমাহীর (রা) হাতে পৌঁছিয়ে দেন।

থলে খুলে দীনারগুলো দেখেই তিনি বলে ওঠেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"

তাঁর মুখে এই কথা শুনে স্ত্রী শংকিত মনে এগিয়ে আসেন এবং বলেন, "সায়ীদ কি হয়েছে? আমীরুল মুমিনীন কি মারা গেছেন?"

তিনি বললেন, "না, বরং তার চেয়েও বড়ো কিছু।"

স্ত্রী বললেন, "মুসলিমদের ওপর কি বড়ো কোন মুসীবাত আপতিত হয়েছে?"

তিনি বললেন, "না। তার চেয়েও বড়ো কিছু।"

স্ত্রী বললেন, "সেই বড়ো কিছুটা কি?"

সায়ীদ বললেন, "আমার আখিরাতকে বরবাদ করার জন্য দুনিয়া আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে। আমার ঘরে বিপদ এসে পড়েছে।"

স্ত্রী বললেন, "বিপদটা দূর করে দিন।"

সায়ীদ বললেন, "এই ব্যাপারে তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?"

স্ত্রী বললেন, "অবশ্যই।"

অতপর সায়ীদ দীনারগুলো ভাগ করে কয়েকটি থলেতে ভরে হিম্‌সের দরিদ্র ব্যক্তিদের মাঝে বিলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন।

আবু যার আলগিফারীর (রা)
অল্পে তুষ্টি

মাক্কা থেকে সিরিয়ার দিকে যেতে ওয়াদ্দান উপত্যকা অতিক্রম করতে হয়।
এই উপত্যকাতে বাস করতো বানু আলগিফার।
এই গোত্রেরই এক সন্তান ছিলেন আবু যার জুনদুব ইবনু জুনাদাহ (রা)।

একেবারে গোড়ার দিকে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে হাত রেখে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
অতপর তিনি আসেন কা'বার চত্বরে।
বুলন্দ কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন, "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।"

চারদিকে মুশরিকরা গিজগিজ করছিলো।
সেখানে দাঁড়িয়ে একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া চাট্টিখানি কথা ছিলো না।
আবু যার আলগিফারী (রা) মাথা উঁচিয়ে সেই ঘোষণাই দিলেন।

মুশরিকরা লাঠি হাতে ছুটে আসে।
নির্দয়ভাবে তাঁকে পিটাতে থাকে।
পিটুনি খেতে খেতে তিনি মাটিতে পড়ে যান।
উন্মত্তের মতো লোকেরা তাঁকে পিটাতেই থাকে।
আল আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব হস্তক্ষেপ করে তাঁকে ছাড়িয়ে নেন।

অতপর আবু যার আলগিফারী (রা) মাক্কা ত্যাগ করেন।
ফিরে যান ওয়াদ্দান উপত্যকায়।

আত্মনিয়োগ করেন আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহর কাজে।
তাঁর প্রচেষ্টায় বানু আলগিফারের বহুলোক ইসলাম গ্রহণ করেন।
আল আহ্যাব যুদ্ধের পর তিনি আল-মাদীনায় হিজরাত করেন।
আল্লাহর রাসূলের (সা) সান্নিধ্যে থাকা শুরু করেন।
ওহীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে থাকেন।

আবু যার আলগিফারী (রা) সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন।
সাধারণ খাবার খেতেন।
সাধারণ পোষাক পরতেন।

আবু যার আলগিফারী (রা) সম্পদ সঞ্চয় করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। যাঁদের মাঝে তিনি অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করতেন, তাঁদের তীব্র সমালোচনা করতেন।

জীবনের শেষ পর্বে তিনি আল-মাদীনা থেকে বহুদূরে মরুভূমিতে চলে যান। "রাবজা' নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন।

একবার একব্যক্তি তাঁর বাসস্থানে এসে দেখেন সেখানে কোন মাল-মাত্তা নেই। তিনি আবু যারকে (রা) জিজ্ঞেস করেন, "আপনার মাল-মাত্তা কোথায়? জওয়াবে তিনি বলেন, "আখিরাতে আমার একটি ঘর রয়েছে। আমি সব মাল-মাত্তা সেখানেই পাঠিয়ে দিয়েছি।"

আবু হুরাইরার (রা)
অল্পে তুষ্টি

আবু হুরাইরা আদ দাওসী (রা) খুবই অল্পে তুষ্ট মানুষ ছিলেন।
আল-মাদীনায় আসার পর তিনি আছহাবুছ্ ছুফ্ফার একজন ছিলেন।
আল্লাহর রাসূলের (সা) হাদীস মুখস্থ করার দিকে তিনি দারুণভাবে মনোযোগী ছিলেন।

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে তিনি বাহরাইনের গভর্ণর নিযুক্ত হন।
কিন্তু বিলাসিতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।
মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকালেও তিনি আল-মাদীনার গভর্ণর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।
তখনো তিনি সাদাসিধে জীবন যাপন করেছেন।

একবার আল-মাদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকাম আবু হুরাইরার (রা) কাছে একশত দীনার (স্বর্ণ-মুদ্রা) পাঠান।
পরের দিন সকালে মারওয়ান আবার লোক পাঠিয়ে তাঁকে জানান যে তাঁর চাকর দীনারগুলো তাঁকে ভুল করে দিয়ে এসেছে।

এইকথা শুনে আবু হুরাইরা (রা) ভীষণ লজ্জিত হন।
তিনি বার্তাবাহককে বললেন, "আমি তো দীনারগুলো আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছি। রাত পোহানো পর্যন্ত একটি দীনারও আমার নিকট ছিলো না। আগামীতে বাইতুলমাল থেকে যখন আমার ভাতা দেয়া হবে, তখন সেখান থেকে তা নিয়ে নেবে।"

পরে তিনি জানতে পারেন যে আসলে মারওয়ান দানশীলতা বিষয়ে তাঁকে পরীক্ষা করছিলেন।

সালমান আলফারসীর (রা)
অল্পে তুষ্টি

ইরানের ইসফাহান অঞ্চলে বুজাখশান নামে এক জমিদার ছিলো।
এই জমিদার ছিলো অগ্নিপূজক।

বুজাখশানের পুত্র ছিলেন মাবাহ্।
একদিন মাবাহ্ তাঁর আব্বার নির্দেশে খামার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন।
পথে ছিলো খৃস্টানদের একটি উপাসনালয়।
খৃস্টানরা তখন উপাসনায় মশগুল ছিলো।
তা দেখে মাবাহ্ প্রভাবিত হন।
এই কথা জানতে পেরে তাঁর আব্বা তাঁকে গৃহবন্দী করে।
এক সুযোগে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে সিরিয়া চলে যান।
বহু স্থানে বহু খৃস্টান রাহিবের সান্নিধ্যে থেকে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।
অবশেষে তিনি একটি কাফিলার সাথে আরব দেশে প্রবেশ করেন।
ওয়াদিউল কুরাতে পৌঁছলে কাফিলার সরদার ইয়াসরিবের এক ইয়াহুদীর কাছে তাঁকে বিক্রয় করে দেয়।

এই দিকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) হিজরাত করে ইয়াসরিব আসেন।
সুযোগ করে মাবাহ্ একদিন তাঁর নিকট পৌঁছেন।
তাঁর আলোচনা শুনে তিনি বুঝতে সক্ষম হন যে ইনিই সেই নবী যাঁর আবির্ভাবের কথা তিনি শুনে আসছিলেন।
তিনি নবীকে (সা) তাঁর দীর্ঘ সফরের ঘটনাগুলো শুনান।
তিনি আল্লাহর রাসূলের (সা) হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেন।
আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর নাম রাখেন সালমান।

আল্লাহর রাসূল (সা) এবং অন্য মুসলিমদের সহযোগিতায় সালমান (রা) ইয়াহুদীর গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করেন।

আল আহযাব যুদ্ধের প্রাক্কালে সালমান আল ফারসীর (রা) পরামর্শেই আল্লাহর রাসূল (সা) পরিখা খনন করে আল-মাদীনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করেন।

আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে তিনি মাদাইনে গভর্ণর নিযুক্ত হন।

তাঁর জন্য বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারিত হয়।

তিনি এই অর্থ বিত্তহীন লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন।

নিজের হাতে তৈরি চাটাই বিক্রয় করে অর্জিত অর্থ দ্বারা তিনি তাঁর রুটির খরচ মেটাতেন।

তিনি সাধারণ খাবার খেতেন।

সাধারণ পোষাক পরতেন।

তাঁর একটি মাত্র পশমী কম্বল ছিলো।

তিনি প্রায়ই নিজের হাতে আটা তৈরি করতেন।

তাঁর নিজের কোন বাড়ি-ঘর ছিলো না।

একদিন এক ব্যক্তি তাঁকে একটি ঘর তৈরি করে দেয়ার প্রস্তাব দেন।

তিনি রাজি হলেন না।

সেই ব্যক্তি পীড়াপীড়ি করতেই থাকেন।

অবশেষে তিনি রাজি হন।

তবে এই শর্তে যে সেই ঘর এতো ছোট হতে হবে যাতে শুইলে তাঁর পা দেয়াল স্পর্শ করে এবং দাঁড়ালে তাঁর মাথা ছাদে ঠেকে।

সালমান আল ফারসীর (রা) চিন্তা-চেতনায় সব সময় আখিরাত প্রাধান্য বিস্তার করে থাকতো।

তিনি বলতেন, "তিন ব্যক্তির ব্যাপার আমার কাছে খুব বিস্ময়কর ঠেকে।

প্রথম সেই ব্যক্তি যে দুনিয়ার তালাশে আছে, অথচ তার তালাশে আছে মৃত্যু।

দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি যে মৃত্যুর কথা ভুলে আছে, অথচ মৃত্যু তাকে ভুলে যায়নি।
তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে হো হো করে হাসে, অথচ সে জানে না আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট।"

একবার আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছিলেন, "দুনিয়ায় তোমার এতোটুকু সম্পদই যথেষ্ট যা কোন মুসাফিরের নিকট পাথেয় রূপে থাকে।"
সালমান আল-ফারসী (রা) আল্লাহর রাসূলের (সা) এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে গেছেন।
শীর্ষ স্থানীয় অল্পে তুষ্ট মানুষদের তিনি ছিলেন একজন।

আবু আবদিল্লাহ হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানের (রা) অল্পে তুষ্টি

আল ইয়ামান (রা) বানু আব্‌সের সন্তান ছিলেন।
বানু আবদিল আশহালের সাথে মৈত্রী চুক্তি করে তিনি ইয়াসরিবে বসবাস করতে থাকেন।
ঐ গোত্রেই তিনি বিয়ে করেন।
এই স্ত্রীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের ছেলে হুজাইফা।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মাক্কায় অবস্থানকালে আল ইয়ামান ও হুজাইফা মাক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ইয়াসরিবে ফিরে আসেন।

হুজাইফা (রা) বহু গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি ছিলেন।
তিনি ছিলেন দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ।
কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন সাহসী যোদ্ধা।
তদুপরি তিনি প্রশাসনিক যোগ্যতারও অধিকারী ছিলেন।

আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে হুজাইফা (রা) কিছুকালের জন্য মাদাইনে গভর্ণর নিযুক্ত হন।

নিযুক্তি লাভের পর তিনি তাঁর সাধারণ পোষাক পরেই একটি ঘোড়ায় চড়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যান।
এইদিকে নতুন গভর্ণরকে খোশআমদেদ জানাবার জন্য মাদাইনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শহরের উপকণ্ঠে অপেক্ষা করতে থাকেন।
অনেক সময় চলে যায়।
তাঁরা নতুন গভর্ণরের সাক্ষাত পেলেন না।
তাঁরা বুঝতেই পারেননি যে তাঁদের গভর্ণর তাঁদেরকে অতিক্রম করে অনেক আগেই চলে গেছেন।
হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) মাদাইনবাসীকে একটি স্থানে একত্রিত হওয়ার অনুরোধ জানান।
লোকেরা সমবেত হলে তিনি তাঁদেরকে আমীরুল মুমিনীনের ফরমান পড়ে শুনান।

ফরমানের একাংশে লিখা ছিলো, “হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানকে তোমাদের আমীর নিয়োগ করা হলো।
তোমরা তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং আনুগত্য করবে।
তোমরা তাঁর প্রয়োজন পূরণের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।”

ফরমান পাঠ শেষ হলে লোকেরা বললো, আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা আমাদেরকে বলুন।”
হুজাইফা বললেন, “আমার পেটের জন্য আর আমার সওয়ারীর জন্য খাদ্য চাই। এর অতিরিক্ত আর কিছুরই আমার প্রয়োজন নেই।”

গভর্ণর হয়েও তিনি ছোট্ট একটি ঘরে বাস করতেন।
সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন।
নিজের খাদ্য-পানীয় কেনার জন্য ভাতার একটি অংশ নিজের কাছে রাখতেন।
অবশিষ্ট অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিতেন।

একবার আমীরুল মুমিনীন তাঁর প্রয়োজন পূরণের জন্য কিছু অর্থ পাঠান। অর্থ তাঁর হাতে পৌঁছার সাথে সাথেই তিনি তা অন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

একবার আমীরুল মুমিনীন তাঁকে আল-মাদীনায় ডেকে পাঠান।
গভর্ণর হওয়ার পর তাঁর জীবনধারায় কেমন পরিবর্তন এসেছে তা দেখার জন্য তিনি পথিমধ্যে একটি বাগানে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন।
হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) যথাসময়ে সেই স্থানে পৌঁছেন।
আমীরুল মুমিনীন উমার (রা) লক্ষ্য করলেন হুজাইফা যেই অবস্থায় আল মাদীনা থেকে গিয়েছেন সেই অবস্থাতেই ফিরে আসছেন।।
বিলাসিতা তাঁকে স্পর্শ করেনি।

আমীরুল মুমিনীন আড়াল থেকে বেরিয়ে তাঁকে খোশ আমদেদ জানান। আনন্দের আতিশয্যে তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং বলেন, “হুজাইফা, তুমি আমার ভাই, আমি তোমার ভাই।”

আছহাবে
রাসূলের
রাত্রি জাগরণ

আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিকের (রা) রাত্রি জাগরণ

আযাদ এবং বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিকই (রা) সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।
ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি বেশিরভাগ সময় আল্লাহর রাসূলের (সা) সান্নিধ্যে কাটাতেন।
আল্লাহর রাসূল (সা) প্রতিদিনই তাঁর বাড়িতে যেতেন।
তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ আদান-প্রদান করতেন।
আল্লাহর রাসূলের (সা) হিজরাত কালে আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) তাঁর সফর সংগী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।
আল্লাহর রাসূল (সা) মাসজিদে নববীতে ছালাতের ইমামত্ করতেন।
তাঁর পেছনে প্রথম সারিতে দাঁড়াতেন বিশিষ্ট ছাহাবীগণ।
খুবই কাছের ব্যক্তিটি হতেন আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা)।

আবু বাকর (রা) একজন বীর যোদ্ধাও ছিলেন
বদর থেকে শুরু করে সব ক'টি যুদ্ধে তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন।
যুদ্ধের ময়দানে কয়েকজন বিশিষ্ট মুজাহিদ আল্লাহর রাসূলের (সা) সামনে সামনে চলতেন।
আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) ছিলেন তাঁদের একজন।

প্রতিরাতে ছালাতুল ইশার পর আল্লাহর রাসূল (সা) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই জন ব্যক্তির সাথে বসে পরামর্শ করতেন।
তাঁদের একজন ছিলেন আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা)। অপর জন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর তিনি রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচিত হন।
তখন থেকে আমৃত্যু তিনি মাসজিদে নববীতে ছালাতের জামাআতে ইমামত করেন।

তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আল্লাহ প্রেমিক।
তিনি সুমধুর কণ্ঠে আল-কুরআন পড়তেন।
মাক্কায় অবস্থানকালে তিনি তাঁর ঘরে বসে আল-কুরআন পড়তেন।
নিকটবর্তী ঘরগুলো থেকে মুশরিকদের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা তাঁর ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর সুমধুর তিলাওয়াত শুনতো।
আল-কুরআন পড়াকালে তিনি প্রায়ই কেঁদে ফেলতেন।

রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবে আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) বড়ো বড়ো ফিতনার সম্মুখীন হন।
ঐসব ফিতনার মুকাবিলায় তিনি ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন।
আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কোন কিছুর ভয় তাঁর মনে ঠাঁই পেতো না।

রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবে তিনি সারাদিন পরিশ্রম করতেন।
তদুপরি প্রায়ই তিনি ছাওম পালন করতেন।
কিন্তু রাতের গভীরে তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন।
ছালাতে দাঁড়িয়ে তিনি একটুও নড়া-চড়া করতেন না।
তখন তাঁকে স্ট্যাচু বলে মনে হতো।

রাতের ছালাতে তিনি দীর্ঘ সূরা পড়তেন।
আয়াতের অর্থের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন।
রুকু ও সাজদায় দীর্ঘ সময় কাটাতেন।
আল্লাহর স্মরণে তিনি বিগলিত হয়ে যেতেন।
চোখের পানিতে বুক ভাসাতেন।
আল্লাহর রাসূলের (সা) মাধ্যমে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন।
এটি ছিলো তাঁর জীবনের পরম সফলতা।
মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাঁকে এই সফলতা দান করেছেন।
সেই জন্য রাতের গভীরে সাজদায় তাসবীহ পাঠ করে করে তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) রাত্রি জাগরণ

মাসজিদে নববীতে আল্লাহর রাসূল (সা) ছালাতের জামায়াতে ইমামত করতেন।
বিশিষ্ট ছাহাবীগণ প্রথম সারিতে তাঁর পেছনে দাঁড়াতেন।
উমার (রা) হতেন তাঁদের একজন।

আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) আল-মাদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধান হয়ে মাসজিদে নববীতে ছালাতের জামাআতের ইমামত করতেন।
বিশিষ্ট ছাহাবীগণ প্রথম সারিতে তাঁর পেছনে দাঁড়াতেন।
উমার (রা) হতেন তাঁদের একজন।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন।
বদর থেকে শুরু করে সব ক'টি যুদ্ধে তিনি আল্লাহর রাসূলের (সা) সংগে ছিলেন।
কয়েকজন বিশিষ্ট ছাহাবী যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর রাসূলের (সা) আগে আগে চলতেন।
তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।

আমীরুল মুমিনীন হওয়ার পর মাসজিদে নববীতে ছালাতের জামায়াতে ইমামতের দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়ে।
তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ প্রেমিক।
অত্যন্ত বিনম্রভাবে তিনি ছালাতে দাঁড়াতেন।
গভীর একাগ্রতা নিয়ে ছালাত আদায় করতেন।
মধুর কণ্ঠে আল-কুরআন পড়তেন।
আয়িশা (রা) বলেন, "উমার হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কারী।"

আয়াতের অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সুস্পষ্টভাবে আল-কুরআন পড়তেন। একবার ছালাতে "ইন্নামা আশ্‌কু বাচ্চি ওয়া হুযনি ইলাল্লাহ" (আমি আমার কষ্ট-দুঃখ-বেদনা একমাত্র আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি) আয়াতটি পড়াকালে তিনি এমনভাবে কেঁদে ফেলেন যে পেছনের সারির লোকেরাও তা শুনতে পান।

আমীরুল মুমিনীন হিসাবে তাঁকে সারাদিন ব্যস্ত সময় কাটাতে হতো।
বিশাল রাষ্ট্রের বহুবিধ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হতো।
তিনি সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতেন।
সেনাপতি ও সৈন্যদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন।
দিনে প্রায়ই ছাওম পালন করতেন।
কিন্তু রাতের গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে একান্তে আল্লাহর কাছে হাজিরা দেয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠতেন।

ছালাতুত্‌ তাহাজ্জুদে তিনি দীর্ঘ সূরা পড়তেন।
রুকু ও সাজদায় দীর্ঘ সময় কাটাতেন।
ছালাতে দাঁড়িয়ে নিজকে ভুলে যেতেন।
আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হয়ে পড়তেন।

উমার (রা) ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের একজন।
এটি ছিলো তাঁর জীবনের পরম সফলতা।
আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অনুগ্রহ করে তাঁকে এই সফলতা দান করেছেন।
কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে সাজদায় তাসবীহ পাঠ করে করে তিনি রাত কাটিয়ে দিতেন।

উসমান ইবনু আফফানের (রা) রাত্রি জাগরণ

উসমান (রা) ছিলেন একজন দক্ষ সৈনিক।
উহুদ থেকে শুরু করে পরবর্তী যুদ্ধ অভিযানগুলোতে তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলেন।
যুদ্ধ অভিযানে কয়েকজন বিশিষ্ট ছাহাবী আল্লাহর রাসূলের (সা) আগে আগে চলতেন।
উসমান (রা) ছিলেন এই বাছাইকরা ব্যক্তিদের একজন।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা), আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কর্তৃক পরিচালিত ছালাতের জামাআতে উসমান (রা) হতেন প্রথম কাতারের মুছাল্লীদের একজন।
উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাহাদাতের পর উসমান ইবনু আফফান (রা) আল-মাদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধান হন।
তাঁর পূর্বসূরীদের মতো তিনিও মাসজিদে নববীতে ছালাতের জামাআতে ইমামত করতেন।
তিনিও সুমধুর কণ্ঠে আল-কুরআন পড়তেন।

উসমান (রা) দিনের বেলা রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকতেন।
তিনি প্রায় প্রতিদিনই ছাওম পালন করতেন।
রাত গভীর হলেই তিনি ছালাতের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠতেন।
তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আল্লাহ প্রেমিক।
কখনো রাতের একাংশ আবার কখনো পুরো রাত তিনি ছালাতে কাটাতেন।
এক বর্ণনা মতে, রাতের ছালাতে তিনি পুরো আল-কুরআন পড়া শেষ করতেন।

অত্যন্ত বিনম্রভাবে তিনি ছালাত আদায় করতেন।
আল-কুরআনের পঠিত আয়াতগুলোর অর্থের দিকে নজর রাখতেন।
আল্লাহর স্মরণে তিনি এমনভাবে ডুবে যেতেন যে দুনিয়ার সব কিছু ভুলে যেতেন।

উসমান (রা) ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের একজন।
সারাদিনের কাজ আর রাতের ইবাদাতে আল্লাহর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা বোধের ছাপ পরিস্ফূট হয়ে ওঠতো।

আলী ইবনু আবী তালিবের (রা) রাত্রি জাগরণ

আলী ইবনু আবী তালিব (রা) ছিলেন অন্যতম বীর যোদ্ধা।
বদর থেকে শুরু করে সবগুলো যুদ্ধে তিনি আল্লাহর রাসূলের (সা) সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলেন।
যুদ্ধের ময়দানে অগ্রসর হওয়াকালে কয়েকজন বিশিষ্ট ছাহাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে থাকতেন।
আলী (রা) ছিলেন সেই সম্মানিত ব্যক্তিদের একজন।
উসমান ইবনু আফফানের (রা) শাহাদাতের পর এক কঠিন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আলী (রা) আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত হন।
এবার মাসজিদে নববীতে ছালাতের জামাআতের ইমামতের দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়ে।
কুফায় রাজধানী স্থানান্তরিত করার আগ পর্যন্ত তিনি মাসজিদে নববীতে ছালাতের জামাআতে ইমামত করতে থাকেন।

আলী ইবনু আবী তালিব (রা) ছিলেন শ্রেষ্ঠ আল্লাহ প্রেমিকদের একজন।
ছালাতের আযান শুনলে তাঁর শরীরে কম্পন সৃষ্টি হতো।
সব কাজ স্থগিত করে তিনি দ্রুত মাসজিদে পৌঁছতেন।
ধীরে সুস্থে ছালাত আদায় করতেন।

দিনের বেলা প্রায়ই তিনি ছাওম পালন করতেন।
সারাদিন রাষ্ট্রীয় কাজে দারুন ব্যস্ত থাকতেন।
রাত হলেই একান্তে আল্লাহর সাথে আলাপের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।
কখনো রাতের একাংশ, কখনো সারারাত তিনি ছালাতে কাটাতেন।

রাতের ছালাতে তিনি দীর্ঘ সূরা পড়তেন।
মধুর কণ্ঠে আল-কুরআন পড়তেন।
রুকু ও সাজদায় দীর্ঘ সময় লাগাতেন।
হিসাব দিনের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে তিনি কেঁপে ওঠতেন।
তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো।
ছালাতে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছুই ভুলে যেতেন।
আলী ইবনু আবী তালিব (রা) ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন।
আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধে সর্বদা বিনম্র হয়ে থাকতেন।
সাজদাতে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে করে তিনি রাত কাটিয়ে দিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাসের (রা) রাত্রি জাগরণ

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) ছিলেন উঁচু মাপের মুত্তাকীদের একজন।
তিনি প্রায়ই নফল ছাওম পালন করতেন।
আর রাতের বেশিরভাগ সময় ছালাতে কাটাতেন।
আবাসে এবং প্রবাসে তাঁর জীবনধারা ছিলো একই রকম।

আবদুল্লাহ ইবনু মুলাইকা তাঁর সফরকালীন ইবাদাতের একটি চিত্র তুলে ধরেন।
একবার আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) মাক্কা থেকে আল-মাদীনার পথে সফরে ছিলেন।
মানযিলের পর মানযিল অতিক্রম করে তিনি চলছিলেন।
রাত হলে সফরসংগীরাসহ পথিমধ্যে তাঁবু খাটিয়ে নিতেন।
ক্লান্ত দেহে সংগীরা ঘুমিয়ে পড়তেন।
আর আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন।
রাতের বিরাট অংশ ছালাতে কাটিয়ে দিতেন।

এক রাতে তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে সূরা 'কাফ' পড়ছিলেন।
ঊনিশ নাম্বার আয়াতে এসে তিনি আর সামনে এগুতে পারছিলেন না।
"ওয়া জা-আত সাকরাতুল মাউতি বিল হাক্কি, যালিকা মা কুনতা মিনহু তাহীদ" [এবং মৃত্যুর কষ্ট বাস্তবভাবে উপস্থিত। এথেকেই তো তুমি পালিয়ে বেড়াতে।]
–আয়াতটি তিনি বারবার আওড়াচ্ছিলেন।
দুই চোখ থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকে পানি।
ছুবহি ছাদিক পর্যন্ত তিনি এই ভাবেই কাটিয়ে দেন।

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) আল্লাহর ভয়ে এতো কাঁদতেন যে তাঁর দুই চোখের নীচে দুইটি কালো দাগ পড়ে গিয়েছিলো।

মু'য়ায ইবনু জাবালের (রা) রাত্রি জাগরণ

অন্যতম আনছার ছাহাবী মু'য়ায ইবনু জাবাল (রা) ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার।

তিনি অকাতরে মানুষের কাছে দীনের জ্ঞান বিতরণ করতেন।

যুদ্ধের ডাক পড়লে যুদ্ধের ময়দানে ছুটে যেতেন।

বীর বিক্রমে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তেন।

আবার গভীর রাতে ওঠে ছালাতুত্ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন।

মহামহিম আল্লাহর সাথে মন উজাড় করে কথা বলতেন।

আল্লাহর উদ্দেশ্যে তিনি প্রায়ই বলতেন, "হে আল্লাহ, এখন তো চোখগুলো নিদ্রিত, কিন্তু চিরঞ্জীব সত্তা আপনি জাগ্রত।

হে আল্লাহ, জান্নাতের পথে আমার পথচলা খুবই মন্থর, জাহান্নাম থেকে পালানোর প্রয়াস খুবই দুর্বল। আপনি আপনার নিকট আমার জন্য একটি অনুগ্রহ নির্দিষ্ট করে রাখুন যা আমি শেষ বিচারের দিন লাভ করতে পারি।"

মু'য়ায ইবনু জাবাল (রা) এইভাবে আল্লাহর সাথে কথা বলতেন।

আর তাঁর দুই চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তো অশ্রু।

মু'য়ায ইবনু জাবাল (রা) ছিলেন অতি উঁচু মাপের আল্লাহ-প্রেমিকদের একজন।

আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনিল 'আসের (রা)
রাত্রি জাগরণ

'আমর ইবনুল 'আসের (রা) পূর্বেই তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ (সা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

মাক্কা বিজয়ের পূর্বে 'আমর ইবনুল 'আস (রা) এবং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রা) আল-মাদীনায় হিজরাত করেন।

আবদুল্লাহ (রা) চেষ্টা করতেন যাতে বেশি বেশি আল্লাহর রাসূলের (সা) ছুহবাত পাওয়া যায়।

আল-কুরআন মুখস্থ করার সাথে সাথে তিনি বহু সংখ্যক আল-হাদীস মুখস্থ করেন।

আল মাদীনায় আসার পর সব কয়টি যুদ্ধে তিনি আল্লাহর রাসূলের (সা) সাথে অংশ নেন।

যুদ্ধের ময়দানে তিনি থাকতেন প্রথম সারিতে।

যুদ্ধ শেষে তিনি মাসজিদে গিয়ে ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন।

তিনি খুব বেশি নফল ইবাদাত করতেন।

সারাদিন ছাওম পালন করা এবং সারা রাত জেগে ছালাত আদায় করা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়।

বিষয়টি আল্লাহর রাসূলের (সা) কানে যায়।

তিনি আবদুল্লাহকে (রা) ডেকে পাঠান।

আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, 'আবদুল্লাহ, আমি জানতে পেরেছি, তুমি সংকল্প গ্রহণ করেছো সারা জীবন দিনে রোযা রাখবে এবং রাত নামাযে কাটাবে। কথা কি সত্যি?"

তিনি বললেন? "হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "সেই শক্তি তোমার নেই। অতএব রোযা রাখ, আবার ছাড়। নামায পড়, আবার বিশ্রাম নাও। মাসে তিনটি রোযা রাখ। প্রতিটি নেক কাজের বিনিময় তো দশ গুণ।"
আবদুল্লাহ বললেন, "আমি এর চে' বেশি শক্তি রাখি।"
আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "একদিন রোযা রাখ, দুইদিন বিরতি দাও।"
আবদুল্লাহ বললেন, "আমি এর চে' বেশি শক্তি রাখি।"
আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "তাহলে একদিন রোযা রাখবে, একদিন রোযা রাখবে না। এইভাবে রোযা রাখতেন দাউদ (আ)।"
আবদুল্লাহ বললেন, "আমি এর চেয়েও উত্তম রোযা রাখতে পারি।"
আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "এর চেয়ে উত্তম রোযা নেই।"

অতপর আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) বাকি জীবন আল্লাহর নবী দাউদের (আ) অনুকরণে একদিন পরপর রোযা রাখতেন।
রাতে তিনি নিবেদিত হতেন নফল ছালাতে।
রাতের বেশিরভাগ সময় তিনি ছালাতে কাটাতেন।
রাতের ছালাতে তিনি কয়েকদিনে একবার আল-কুরআন খতম করতেন।
আল্লাহ প্রেমিক আবদুল্লাহ (রা) রাতের ছালাতে দাঁড়িয়ে দুনিয়াকে ভুলে যেতেন।

উসমান ইবনু মাযউনের (রা) রাত্রি জাগরণ

উসমান উবনু মাযউন (রা) ছিলেন মাক্কার এক সু-সন্তান।
ইসলাম গ্রহণ করার আগেও তিনি সুন্দর জীবন যাপন করতেন।
চারদিকে তখন মদের ছড়াছড়ি।
মাক্কার যেই কয়জন মানুষ মদের কাছে ঘেঁষতেন না, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।

একেবারে গোড়ার দিকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী চৌদ্দতম ব্যক্তি।
তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জানা জানি হয়ে গেলে তাঁর উপর নির্যাতন শুরু হয়।
এক সময় তিনি হাবশায় হিজরাত করেন।
কিছুকাল পর তিনি গুজব শুনতে পান যে মাক্কার সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।
তিনি মাক্কায় ফিরে আসেন।
দেখেন, অবস্থা আগের চেয়েও সংগীন।
একদিন মুশ্‌রিকদের এক সমাবেশে তিনি মার খান।
মুশরিকদের কিলঘুষিতে তাঁর একটি চোখ রক্ত জমে কালো হয়ে যায়।
অতপর তিনি ইয়াসরিবে হিজরাত করেন।

উসমান ইবনু মাযউন (রা) ছিলেন দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ।
আখিরাতের চিন্তাতেই তিনি মশগুল থাকতেন।
নিষ্ঠাসহকারে ফারয ইবাদাত পালন করতেন।
তদুপরি নফল ইবাদাতের প্রতি তাঁর ছিলো দারুণ আগ্রহ।
দুই চারটে দিন ছাড়া সারা বছর তিনি ছাওম পালন করতেন।

সারা রাত কাটাতেন ছালাতে।
স্ত্রীর প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারেও তিনি উদাসীন হয়ে পড়েন।
বিষয়টি আল্লাহর রাসূলের (সা) কানে যায়।
তিনি তাঁকে ডেকে পাঠান।

আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁকে বলেন, "আমি কি তোমার জন্য উসওয়াতুন হাসানা নই?"
তিনি বললেন, "আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোন।"
আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "তুমি কি প্রায় প্রতিদিন ছাওম পালন কর এবং সারা রাত ছালাতে কাটাও?"
তিনি বললেন, "হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।"
আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর জীবনে ভারসাম্য আনার জন্য বললেন, "না, এই রূপ করবে না। তোমার ওপর তোমার চোখের, তোমার দেহের এবং তোমার স্ত্রীর হক আছে। অতএব ছাওম পালন করবে, আবার করবে না। রাতে আরাম করবে, আবার ছালাতও আদায় করবে।"
অতপর, উসমান ইবনু মাযউন (রা) কোন দিন ছাওম পালন করতেন, কোন দিন করতেন না।
রাতের কিছু অংশ বিশ্রামে ও স্ত্রীর সান্নিধ্যে কাটাতেন।
বাকি অংশ কাটাতেন ছালাতে।
শেষ রাতের ছালাতে দাঁড়িয়ে তিনি দুনিয়াকে ভুলে যেতেন।
মহামহিম আল্লাহর প্রেমে ডুবে যেতেন।

যায়িদ ইবনু হারিসার (রা) রাত্রি জাগরণ

যায়িদ (রা) ছিলেন ইয়ামানের বানু কালাবের সরদার হারিসা ইবনু শারাহিলের ছেলে।

আম্মার সাথে নানার বাড়ি যাবার পথে তিনি বানু কাইনের লোকদের দ্বারা অপহৃত হন।
অপহরণকারীরা তাঁকে বিক্রয়ের জন্য উকায বাজারে নিয়ে আসে।
খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদের (রা) ভাইয়ের ছেলে হাকীম ইবনু হিযাম তাঁকে কিনে নেন এবং তাঁর ফুফু খাদীজাকে (রা) উপহার দেন।

এর কিছুকাল পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদের (রা) বিয়ে হয়।
খাদীজা (রা) টুকটাক কাজ করার জন্য যায়িদকে (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হস্তান্তর করেন।

এইভাবে যায়িদ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সান্নিধ্যে আসেন।
তখন তাঁর বয়স আট বছর।

হাজ যাত্রীদের মাধ্যমে হারিসা ইবনু শারাহিল তাঁর পুত্রের সন্ধান পান।
আপন ভাইকে সাথে নিয়ে তিনি একদিন মাক্কায় এসে পৌছেন।

তাঁরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাত করেন।
মুক্তিপণ গ্রহণ করে যায়িদকে আযাদ করে দেয়ার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) অনুরোধ করেন।
তিনি জানালেন, যায়িদ যেতে চাইলে মুক্তিপণ গ্রহণ না করেই তিনি তাঁকে যেতে দেবেন।
কিন্তু যায়িদ (রা) কিছুতেই আদর্শ মানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সান্নিধ্য ত্যাগ করতে রাজি হলেন না।
আব্বা ও চাচা খুব করে বুঝালেন।
কাজ হলো না।
এমতাবস্থায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে নিয়ে কা'বার চত্বরে যান

এবং যায়িদকে আযাদ করে পুত্র রূপে গ্রহণ করার ঘোষণা দেন।
হারিসা ইবনু শারাহিল সন্তুষ্ট চিত্তে দেশে ফিরে যান।

ঈসায়ী ৬১০ সনে মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন।
ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম চার জনের মধ্যে যায়িদ (রা) ছিলেন একজন।

আল্লাহর রাসূল (সা) মাক্কার বাইরের কোন গোত্রের কাছে দীনের দা'ওয়াত দেয়ার জন্য যাবার কালে উটের পিঠে নিজের পেছনে যায়িদকে (রা) বসিয়ে নিতেন।
বানু বাকর ও বানু কাহতানের নিকট এবং তায়েফে দা'ওয়াতী তৎপরতা চালানোর সময় যায়িদ (রা) ছিলেন আল্লাহর রাসূলের (সা) একমাত্র সংগী।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের আগেই অন্যদের মতো তিনি হিজরাত করে ইয়াসরিব (আল-মাদীনা) পৌঁছেন।

যুদ্ধের ময়দানে যায়িদ (রা) ছিলেন সাহসী সৈনিক।
মু'তার যুদ্ধে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

যায়িদ (রা) সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন।
খেজুরের পাতার তৈরি মাদুরে শুতেন।
দুধে বা পানিতে ভিজিয়ে রুটি খেতেন।
একদিন এক ব্যক্তি তাঁর সাধারণ পোষাক নিয়ে কথা বলেন।
জওয়াবে তিনি বলেন, "আমাদের ইযযাত তো ইসলামের কারণে। দামি পোশাক পরে কি হবে?"
একদিন এক ব্যক্তি তাঁর আসবাব শূন্য গৃহ সম্পর্কে কথা বলেন।
জওয়াবে তিনি বলেন, "গৃহকে আরামদায়ক করে লাভ কি?
এখেকে তো আমাদেরকে বিদায় নিতেই হবে।"
যায়িদ ইবনু হারিসা (রা) ছিলেন উঁচুমাপের মুত্তাকীদের একজন।
রাতের বেশিরভাগ সময় তিনি ছালাতে কাটাতেন।
সংগীদেরকেও তিনি রাতের শেষ ভাগে জাগিয়ে দিতেন।
ছালাতুত তাহাজ্জুদে তিনি দীর্ঘ সূরা পড়তেন।
আল্লাহর স্মরণে ডুবে থাকতেন।
তাঁর দুই চোখ থেকে গড়িয়ে পড়তো পানি।

আছহাবে
রাসূলের
বীরত্ব

উমাইর ইবনুল হুমাম আল আনছারীর (রা) বীরত্ব

উমাইর ইবনুল হুমাম (রা) ছিলেন বানু খাযরাজের বানু সালামা শাখার সন্তান।

আল্লাহর রাসূল (সা) হিজরাত করে ইয়াসরিবে আসার আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
তিনি একজন লড়াকু ব্যক্তি ছিলেন।
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জনের তিনি ছিলেন একজন।

যুদ্ধের প্রাক্কালে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন।
সেই ভাষণে তিনি বলেন, "এবার তৈরি হয়ে যাও জান্নাতের জন্য, যার বিস্তৃতি আসমান ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান।"
এই কথা শুনে উমাইর ইবনুল হুমাম আল আনছারী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, জান্নাতের বিস্তৃতি আসমান ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান?"
আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "হ্যাঁ।"
উমাইর ইবনুল হুমাম (রা) বলে ওঠলেন,"বাহ্ বাহ!"
আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "এতে অবাক হয়ে বাহ্ বাহ্ বলার কী আছে?"
উমাইর ইবনুল হুমাম (রা) বললেন, "না, আল্লাহর কসম, আমি এই কথা এই আশায় বলেছি যাতে আমি এর অধিবাসী হতে পারি।"
আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসী হবে।"

এই কথা শুনে উমাইর ইবনুল হুমাম (রা) তূনীর থেকে কিছু খেজুর বের করে খেতে শুরু করেন।

হঠাৎ তিনি বলেন ওঠেন, "এই খেজুরগুলো শেষ করা পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকতে চাই সে তো দীর্ঘ সময়।"

এই কথা বলে তিনি অবশিষ্ট খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেন।

তলোয়ার মুক্ত করে তিনি বীর বিক্রমে শত্রু সেনাদের দিকে এগিয়ে চলেন।

নির্ভীকচিত্তে শত্রু সেনাদের মাঝে ঢুকে পড়েন।

ডানে বাঁয়ে তলোয়ার চালাতে থাকেন।

এক সময় এক শত্রু সেনার আঘাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন।

রক্তক্ষরণে নির্জীব হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পৌঁছে যান সেই আকাংখিত মানযিলে যার বিস্তৃতি আসমান ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান।

আন্ নু'মান ইবনু মালিক আল আনছারীর (রা) বীরত্ব

আন্ নু'মান ইবনু মালিক (রা) ছিলেন ইয়াসরিবের বানু খাযরাজের বানু কাওকাল শাখার সন্তান।

এমনিতেই তিনি ছিলেন একজন সাহসী ব্যক্তি।
ইসলাম গ্রহণ করে তিনি হন অসীম সাহসী।

ইখলাছুন্ নিয়াত সহকারে আল্লাহর পথে লড়াই করে শহীদ হলে অবশ্যই জান্নাত পাওয়া যাবে, এই ছিলো তাঁর ইয়াকীন।

হিজরী দ্বিতীয় সনে সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধ।
আল্লাহর রাসূলের (সা) সাথে তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নেন।
জানবাজ সৈনিকরূপে লড়াই করেন।

হিজরী তৃতীয় সনে সংঘটিত হয় উহুদ যুদ্ধ।
আল্লাহর রাসূলের (সা) সাথে মুসলিম মুজাহিদগণ উহুদ প্রান্তরে অবস্থান গ্রহণ করেন।
আন্ নু'মান (রা) ছিলেন তাঁদের একজন।

যুদ্ধ শুরুর আগে আন্ নু'মান ইবনু মালিক (রা) আল্লাহর রাসূলের (সা) কাছে এসে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবো।"
আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "তা কিভাবে?"

আন্‌ নু'মান ইবনু মালিক (রা) বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।
আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আমি যুদ্ধের ময়দান থেকে কখনো ভাগবো না।"
আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "তুমি সত্য বলেছো।"

অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।
আন্‌ নু'মান ইবনু মালিক (রা) বীর বিক্রমে শত্রু সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।
ডানে বাঁয়ে তলোয়ার চালাতে চালাতে সামনে এগিয়ে চলেন।
শত্রুদের ওপর আঘাত হানতে থাকেন।
নিজেও আহত হন।
কিন্তু এক কদমও পিছে হটেননি।

একদল শত্রু সেনা তাঁকে ঘিরে ফেলে।
আঘাতের পর আঘাত হেনে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা করে ফেলে।
প্রতিটি জখম থেকে ঝরতে থাকে তাজা খুন।
জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে।
তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।
তিনি তাঁর অংগীকার সত্যে পরিণত করে জান্নাতের ঠিকানায় চলে যান।

মুস‘আব ইবনু উমাইরের (রা) বীরত্ব

হিজরী তৃতীয় সনে মাক্কার মুশরিক বাহিনী আল-মাদীনা আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। তাদের সংখ্যা ছিলো তিন হাজার।
সাতশত মুজাহিদ নিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আল-মাদীনার উপকণ্ঠে উহুদ প্রান্তরে তাদের মুখোমুখি হন।

যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয় লাভ করেন।
বিজয়ে উল্লসিত হয়ে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান নিরাপদ রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত তীরন্দাজদের বেশিরভাগ স্থান ত্যাগ করেন।
দূর থেকে তা লক্ষ্য করেন মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনীর চৌকস সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ।
তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।
অতর্কিত আক্রমণে ছত্রভংগ হয়ে পড়ে মুসলিমরা।
শত্রু সেনারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পতাকা ছিলো মুস‘আব ইবনু উমাইরের (রা) হাতে।
তিনি পতাকা উঁচুতে ধরে জোরে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিতে থাকেন।
একজন অশ্বারোহী শত্রুসেনা এগিয়ে এসে তাঁর ডান হাতে আঘাত হানে।
তাঁর হাতটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
এর কোন পরোয়াই করলেন না মুস‘আব (রা)।
তিনি বাম হাত দিয়ে পতাকা উঁচুতে তুলে ধরে বুলন্দ কণ্ঠে বলেন, "ওয়া মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, কাদ্ খালাত্ মিন্ কাব্লিহির রুসুল।"

শত্রু সেনা তাঁর বাম হাতে আঘাত হানে।
এই হাতটিও তাঁর দেহচ্যুত হয়ে যায়।
দুই বাহু দিয়ে পতাকা আঁকড়ে ধরে থেকে মুস'আব (রা) উচ্চারণ করেন, "ওয়া মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, কাদ্ খালাত্ মিন্ কাবলিহির রুসুল।"
এবার তাঁকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হয় একটি বল্লম।
বল্লমটি লক্ষ্য ভেদ করে।
এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায় তাঁর শরীর।
দ্রুতবেগে গড়িয়ে পড়তে থাকে রক্ত।
জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে।
পতাকাসহ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।
শাহাদাত লাভের পূর্ব মূহুর্তেও তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, "ওয়া মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, কাদ্ খালাত্ মিন্ কাবলিহির রুসুল।"
[মুহাম্মাদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন।]

আনাস ইবনু নাদারের (রা) বীরত্ব

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ সনে যেই পঁচাত্তর জন ইয়াসরিববাসী আকাবায় আল্লাহর রাসূলের (সা) হাতে শপথ গ্রহণ করেন আনাস ইবনু নাদার (রা) ছিলেন তাঁদের একজন।
কোন কারণে তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি।
সেইজন্য তাঁর মনে দারুণ দুঃখ ছিলো।

হিজরী তৃতীয় সনে সংঘটিত হয় উহুদ যুদ্ধ।
এই যুদ্ধে প্রথম দিকে মুসলিমরা বিজয়ী হন।
কিন্তু কিছু সংখ্যক পাহারাদারের ভুলের কারণে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়।
মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়।
এই সময় গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) শহীদ হয়েছেন।
হতোদ্যম হয়ে পড়েন অনেকেই।

আনাস ইবনু নাদার (রা) কয়েকজন মুসলিমকে নিষ্ক্রিয় দেখে কারণ জানতে চান।
তাঁরা বলেন, "রাসূলুল্লাহ তো শহীদ হয়ে গেছেন।"
তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ যদি মারাই গিয়ে থাকেন তাহলে আপনারা বেঁচে থেকে কী করবেন?
আসুন, আল্লাহর রাসূল যেই পথে জীবন দিয়েছেন আমরাও সেই পথে জীবন দিই।"
এই কথা বলে আনাস ইবনু নাদার (রা) কোষমুক্ত তলোয়ার নিয়ে শত্রু সেনাদের দিকে এগিয়ে যান।
তিনি বলেন, "হে আল্লাহ, মুসলিমরা এখন যা করছে তার জন্য আমি

আপনার নিকট ক্ষমা চাই। আর পৌত্তলিকরা যা করছে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

এই সময় সা'দ ইবনু মুয়াজ (রা) তাঁর সামনে পড়েন।
তিনি জিজ্ঞেস করেন, "কোথায় যাচ্ছেন, আনাস?"
আনাস ইবনু নাদার (রা) বলেন, "সা'দ, আল্লাহর কসম, আমি উহুদের দিক থেকে জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি।"
তাঁকে অগ্রসর হতে দেখে শত্রু সেনারা তাঁর দিকে তীর ও বল্লম ছুঁড়তে থাকে।

অকুতোভয় আনাস (রা) দ্রুত সামনে এগিয়ে শত্রু সেনাদের ওপর আঘাত হানতে থাকেন।
শেষাবধি শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর ও বল্লম তাঁর শরীর ঝাঁঝরা করে ফেলে।
জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে।
তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।
চলে যান জান্নাতের ঠিকানায়।

জা'ফর ইবনু আবী তালিবের (রা) বীরত্ব

হিজরী অষ্টম সনের ঘটনা।
সিরিয়া-ফিলিস্তিন তখন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ।
রোমান সৈন্যরা আলমাদীনা রাষ্ট্রের সিরিয়া সংলগ্ন সীমান্তে প্রায়ই গোলযোগ সৃষ্টি করতে থাকে।
স্থানীয় আরব গোত্রগুলোকেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে।
এই পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) একদল মুজাহিদ তৈরি করেন।
যায়িদ ইবনু হারিসা (রা) সেনাপতি নিযুক্ত হন।
অবশ্য আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, "যায়িদ নিহত হলে সেনাপতি হবে জা'ফর।
আর জা'ফর নিহত হলে সেনাপতি হবে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা।
আর সে নিহত হলে মুসলিমরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে সেনাপতি বানিয়ে নেবে।"

মুসলিম বাহিনী 'মূতা' নামক স্থানে পৌঁছে দেখে এক বিশাল রোমান বাহিনী অপেক্ষমান।
মুসলিম বাহিনীতে ছিলেন মাত্র তিন হাজার যোদ্ধা।

প্রচণ্ড লড়াই হয়।
যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেনাপতি যায়িদ ইবনু হারিসা (রা) শহীদ হন।
অতপর জা'ফর ইবনু আবী তালিব (রা) ইসলামী ফৌজের পতাকা হাতে তুলে নেন।
পতাকা লক্ষ্য করে শত্রু সেনারা এগিয়ে আসে।
এক পর্যায়ে এক শত্রু সেনা তাঁর ডান হাতে আঘাত হানে।
হাতটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

কোন পরোয়া নেই।

আল্লাহর সৈনিকদের পতাকা যেনো ভূলুণ্ঠিত না হয় সেটাই দেখার বিষয়।

তিনি বাম হাত দিয়ে পতাকাটি উঁচুতে তুলে ধরেন।

কিছুক্ষণ পর শত্রুসেনার আঘাতে তাঁর বাম হাতটিও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তখনো নিজের কথা নয়, পতাকার কথাই ভাবেন তিনি।

দুই বাহু দিয়ে জাপ্টে ধরে তিনি ইসলামী পতাকা সমুন্নত রাখেন।

শত্রু সেনার আরেকটি আঘাতে তাঁর দেহ খণ্ডিত হয়ে যায়।

সারা গা থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকে রক্ত স্রোত।

দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

পূর্ণ হয় তাঁর শাহাদাতের আকাংখা।

অকুতোভয় জা'ফর ইবনু আবী তালিব (রা) পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে পৌঁছে যান মহান প্রভুর সান্নিধ্যে।

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাসের (রা) বীরত্ব

অগ্নি পূজক ইরানীদের সম্রাটকে বলা হতো 'কিসরা'।

কিসরা ইয়াজদিগিরদ মুসলিমদের সাথে লড়াই করার জন্য এক বিশাল সৈন্য বাহিনী গড়ে তোলেন।

সেনাপতি রুস্তমের নেতৃত্বে ইরানী বাহিনী অগ্রসর হয়।

তাদের মুকাবিলার জন্য সা'দ ইবনু আবী ওয়াককাস (রা) মুসলিম সৈনিকদেরকে নিয়ে কাদেসিয়া প্রান্তরে পৌঁছেন।

এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মুসলিমরা বিজয় লাভ করেন।

খবর আসে, কিসরা ইয়াজদিগিরদ বহুসংখ্যক ঘোড়া ও গাধার পিঠে মূল্যবান সামগ্রী বোঝাই করে রাজধানী মাদাইন থেকে পালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

মুসলিম সেনাছাউনী এবং রাজধানী মাদাইনের মাঝে ছিলো তাইগ্রিস নদী।

সা'দ (রা) ইয়াজদিগিরদকে পালাবার সুযোগ দিতে চাইলেন না।

তিনি মুসলিম সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন।

ভাষণে তিনি বলেন, "ওহে আল্লাহর বান্দারা, ওহে দীনের সৈনিকরা, সাসানী শাসকরা আল্লাহর বান্দাদেরকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করে বানোয়াট কথার দ্বারা ধোঁকা দিয়ে আগুন ও সূর্যের পূজা করতে বাধ্য করেছে। তাদের ঘামঝরা কষ্টোপার্জিত সম্পদ নিজেদের জন্য পুঞ্জিভূত করেছে। তোমরা যখন তাদের মুক্তিদাতা রূপে উপস্থিত হয়েছো, তখন জনগণের মূল্যবাণ অর্থ-সম্পদ ঘোড়া ও গাধার পিঠে চাপিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। আমরা তাদেরকে এই সুযোগ দেবো না। আমরা যেনো তাদের

নিকট পৌঁছাতে না পারি সেই জন্য পুল ভেংগে দিয়েছে। কিন্তু ইরানীরা আমাদেরকে চেনেনা। তারা জানে না আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারীরা, মানবতার সেবকেরা, পুল বা নৌকার ওপর ভরসা করে না।
আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আমার ঘোড়াটি নদীতে নামিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আমার অনুসরণ কর। একজনের পেছনে একজন, একজনের পাশে একজন থেকে তাইগ্রিস নদী পার হও।
আল্লাহ্‌ আমাদের সহায়।"

ভাষণ শেষে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) "বিসমিল্লাহ্" বলে নদীর অথৈ পানিতে ঘোড়া নামিয়ে দিলেন। তাঁকে অনুসরণ করেন অন্য সব মুজাহিদ। [মুসলিম সৈনিকরা যখন নদীর অপর কিনারায় পৌঁছলেন, আতংকিত ইরানীরা, চিৎকার করে বলতে থাকে, "দৈত্য আসছে, পালাও, পালাও।" রাজধানী মাদাইন মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়।]

আম্মার ইবনু ইয়াসিরের (রা) বীরত্ব

আম্মার (রা) ছিলেন ইয়াসির (রা) এবং সুমাইয়ার (রা) সন্তান।
সুহাইব ইবনু সিনানের (রা) সাথে দারুল আরকামে গিয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুশরিকদের হাতে তিনি নির্যাতিত হন।
অত্যাচার চরমে ওঠলে তিনি ইয়াসরিবে (আল-মাদীনায়) হিজরাত করেন।

আম্মার (রা) একজন লড়াকু ব্যক্তি ছিলেন।
বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত প্রতিটি সামরিক অভিযানে তিনি অংশ নেন।
আবু বাকর আছ ছিদ্দিকের (রা) শাসনকালে সংঘটিত যুদ্ধগুলোতেও তিনি অংশ নেন।
ভণ্ড মুসাইলামার সাথে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে শত্রুর তলোয়ারের আঘাতে তাঁর একটি কান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে।
কিন্তু তিনি সেইদিকে ভ্রুক্ষেপও করলেন না।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী বিশৃংখল হয়ে পড়ে।
যুদ্ধের ময়দানের মাঝখানে ছিলো একটি পাথর।
সেই পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে তিনি উচ্চস্বরে বলেন, "ওহে মুসলিম মুজাহিদগণ, তোমরা কি জান্নাত থেকে পালাচ্ছো? আমি আম্মার ইবনু ইয়াসির। তোমরা আমার দিকে এগিয়ে আস।"

আম্মার ইবনু ইয়াসিরের (রা) এই বক্তব্য মুসলিম মুজাহিদদের মনে নব প্রেরণা সৃষ্টি করে।
তাঁরা তাঁর দিকে এগিয়ে যান।
আবার সুশৃংখল হয়ে ওঠেন।
সম্মিলিতভাবে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।
বিজয় ছিনিয়ে আনেন।

আলবারা' ইবনু মালিকের (রা) বীরত্ব

ইয়াসরিবে (আল-মাদীনায়) ইসলামের পক্ষে গণ-জোয়ার সৃষ্টির কোন এক পর্বে আলবারা' ইবনু মালিক (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

তিনি একজন লড়াকু ব্যক্তি ছিলেন।
বদর যুদ্ধ ছাড়া অন্য সব সামরিক অভিযানে তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) সংগী হন।
হুদাইবিয়াতে অনুষ্ঠিত বাইআতে রিদওয়ানেও তিনি শরীক ছিলেন।

আব্বু বাকর আছ্ ছিদ্দিকের (রা) শাসন কালে ভণ্ড মুসাইলামাকে শায়েস্তা করার জন্য খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের (রা) সেনাপতিত্বে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়।
তাঁরা ইয়ামামা পৌছেন।
তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
মুসাইলামা একটি উঁচু প্রাচীর ঘেরা বাগানে অবস্থান করছিলো।
গেইটে ছিলো কড়া পাহারা।
মুসলিমরা ভেতরে ঢুকতে পারছিলেন না।
আলবারা' ইবনু মালিক (রা) দ্রুত পৌছেন প্রাচীরের কাছে।
উচ্চস্বরে তিনি বলেন, "ওহে লোকেরা, আমি আলবারা ইবনু মালিক, তোমরা আমার দিকে আস, তোমরা আমার দিকে আস।"
একদল মুজাহিদ তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন।
তিনি তাঁদেরকে বলেন, "তোমরা আমাকে উঁচুতে তুলে বাগানে ছুঁড়ে দাও।"
তাঁরা বললেন, "তা কি করে হয়?"

তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, তোমরা অবশ্যই আমাকে ভেতরে ছুঁড়ে দাও।"

সহযোদ্ধারা তাঁকে উঁচুতে তুলে ধরেন।

তিনি প্রাচীরের উপরিভাগ ধরতে সক্ষম হন।

অতপর প্রাচীরে ওঠে হঠাৎ লাফিয়ে পড়েন নীচে।

একদল শত্রু সেনা এগিয়ে আসে।

তিনি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

শত্রু সেনারা কাবু হয়ে পড়ে।

এবার তিনি গেইট খুলে দেন।

বন্যার পানির মতো ভেতরে ঢুকে পড়েন মুসলিম সেনারা।

আলবারা' ইবনু মালিকের (রা) বীরত্ব মুসলিমদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জনে সাহায্য করে।

অভিশপ্ত মুসাইলামা এই বাগানেই নিহত হয়।

আবু আবদিল্লাহ হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানের (রা) বীরত্ব

আবু আবদিল্লাহ হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) ছিলেন বানু গাতফানের বানু 'আবস শাখার এক সন্তান।

তাঁর আব্বা হুসাল ওরফে আলইয়ামান বানু আউসের বানু আবদিল আশহাল শাখার সাথে মৈত্রী চুক্তি করে ইয়াসরিবে বসবাস করতে থাকেন।

তাঁর আম্মা রুবাব বিনতু কা'ব বানু আবদিল আশহালের কন্যা সন্তান ছিলেন।

মাক্কায় যখন মুসলিমদের সংগীন অবস্থা, তখন বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আল ইয়ামান (রা) ও তাঁর ছেলে হুজাইফা (রা) মাক্কায় গিয়ে আল্লাহর রাসূলের (সা) হাতে হাতে রেখে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবু আবদিল্লাহ হুজাইফা (রা) একজন লড়াকু ব্যক্তিরূপে গড়ে ওঠেন।

আল আহযাব পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর তিনি ইরাকে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে ইরানীদের পদানত নিহাওয়ান্দের দিকে সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়।

এই অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত হন নু'মান ইবনু মুকাররিন (রা)।

ত্রিশ হাজার মুসলিম মুজাহিদ দেড় লাখ ইরানী সৈন্যের মুখোমুখি হন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে নু'মান ইবনু মুকাররিন (রা) শহীদ হয়ে যান।

নতুন সেনাপতি হন আবু আবদিল্লাহ হুজাইফা (রা)।

ঘোড়ায় চড়ে ঝড়ের বেগে তিনি ইরানী সৈন্যদের নিকটবর্তী হন।

তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, "আল্লাহু আকবার। ছাদাকা ওয়াদাহু।

আল্লাহু আকবার। নাছারা জুনদাহু। ওহে মুহাম্মাদের অনুসারীরা, এখানে, এইদিকে।

জান্নাত তোমাদেরকে খোশ-আমদেদ জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তোমরা বিলম্ব করো না।

ওহে বদরের যোদ্ধারা, ছুটে আস।

ওহে উহুদ, খন্দক ও তাবুকের বীরেরা, সামনে এগিয়ে চল।"

নির্ভীকচিত্তে আবু আবদিল্লাহ হুজাইফা (রা) সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন।

তাঁর ভাষণে ও ভূমিকায় অনুপ্রাণিত হয়ে ত্রিশ হাজার মুজাহিদ শত্রু সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলিম মুজাহিদরা অগ্নি পূজকদের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন।

নিহাওয়ান্দের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিমদের কর্তৃত্ব।

আবু দুজানা সিমাকের (রা) বীরত্ব

আবু দুজানা সিমাক আল আনছারী (রা) বানু খাযরাজের বানু সায়িদা শাখার সন্তান।
আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) আল-মাদীনায় হিজরাত করে আসার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবু দুজানা (রা) ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা।
বদর যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

উহুদ যুদ্ধের প্রাককালে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) একটি তলোয়ার হাতে নিয়ে বলেন, "এটি কে নেবে?"
উপস্থিত সকলেই হাত বাড়িয়ে বলেন, "আমি, আমি।"
আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "কে পারবে এর হক আদায় করতে?"
এবার সবাই চুপ।
আবু দুজানা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, এর হক কি?"
আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "এর হক হচ্ছে, এর দ্বারা কোন মুসলিমকে হত্যা না করা এবং এটি নিয়ে কাফিরদের ভয়ে পালিয়ে না যাওয়া।"
আবু দুজানা (রা) বললেন, "আমি পারবো এর হক আদায় করতে।"
আল্লাহর রাসূল (সা) তলোয়ারটি তাঁর হাতেই তুলে দেন।

যুদ্ধ শুরু হলে আবু দুজানা (রা) বীর বিক্রমে শত্রু সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।
যেই দিকেই তিনি এগুতেন সেই দিকেই ত্রাস ছড়িয়ে পড়তো।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি মুশরিকদের মহিলাদের ক্যাম্পের নিকট পৌঁছে যান।

তাঁকে অগ্রসর হতে দেখে মহিলারা সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকে।

কিন্তু কোন পুরুষ সেনা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার সাহস করেনি।

আবু দুজানা (রা) তলোয়ারটি হিন্দার মাথার ওপর তুলে তা আবার নামিয়ে নেন।

পরে তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহর রাসূলের তলোয়ার দিয়ে কোন নারীকে হত্যা করতে আমার মন সায় দেয়নি।"

কুরাইশ অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণে মুসলিমরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

উহুদের পাদদেশে যেই কয়জন মুসলিম মুজাহিদ আল্লাহর রাসূলকে (সা) আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন আবু দুজানা (রা) ছিলেন তাঁদের একজন।

শত্রু সেনাদের তীরের আঘাতে তাঁর পিঠ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু তিনি স্থান ত্যাগ করেননি।

কোন শত্রু সেনা খুব কাছে এসে গেলে রক্তাক্ত শরীর নিয়েই তিনি তলোয়ার চালিয়ে তাকে হটিয়ে দিতেন।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের (রা) বীরত্ব

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) একজন লড়াকু ব্যক্তি ছিলেন।
যোদ্ধা হিসেবে তিনি ছিলেন জানবাজ।
সেনাপতি হিসেবে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ।
আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁকে "সাইফুল্লাহ"(আল্লাহর তলোয়ার) উপাধি দিয়েছিলেন।
তাঁর জীবনের বেশিরভাগ কেটেছে যুদ্ধের ময়দানে।
তিনি প্রায় সোয়া শ' যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

যুদ্ধের ময়দানে তিনি রাতে ঘুমাতেন না।
লোক পাঠিয়ে শত্রু পক্ষের তথ্য সংগ্রহ করতেন।
আর তাঁবুতে বসে যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতেন।
তাঁর সংগীরা বলতেন, "খালিদ নিজে ঘুমান না, অন্যদেরকেও ঘুমাতে দেন না।"
খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বলতেন, "নব বধুর সাথে রাত কাটানো কিংবা রাতে কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর পাওয়ার চেয়ে কোন প্রচণ্ড শীতের রাতের শেষে মুহাজিরদের একটি বাহিনী নিয়ে মুশরিক বাহিনীর ওপর হামলা চালানো আমার নিকট অধিক প্রিয়।"

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বেপরোয়া হয়ে যুদ্ধ করতেন।
নির্ভয়ে তিনি শত্রু বাহিনীর মধ্যে ঢুকে যেতেন।
বিদ্যুৎ গতিতে তলোয়ার চালাতেন।
তাঁর হাতে নিহত হয়েছে বহু সংখ্যক শত্রু সেনা।
যুদ্ধে তিনি বারবার আহত হয়েছেন।
তাঁর শরীরের প্রতিটি অংশেই ছিলো আঘাতের চিহ্ন।
তবে যুদ্ধের ময়দানে তিনি নিহত হননি।

শহীদ হতে না পারার বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুকালে আফসোস করতে থাকেন।
আর তাঁর দুই চোখ থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকে অশ্রু।

আবু আইউব খালিদ ইবনু যায়িদ আল আনছারীর (রা) বীরত্ব

আবু আইউব খালিদ (রা) ইয়াসরিবের বানু খাযরাজের বানু নাজজার শাখার সন্তান ছিলেন।

মুস'আব ইবনু উমাইরের (রা) প্রচেষ্টায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু আইউব খালিদ (রা) ছিলেন তাঁদের একজন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরাত করে এসে কিছুদিন কুবা পল্লীতে থাকেন।
অতপর তিনি তাঁর উটনী কাসওয়ার পিঠে চড়ে ইয়াসরিবে প্রবেশ করেন।
কাসওয়া আবু আইউব খালিদ আল আনছারীর (রা) বাড়ির সামনে এসে বসে পড়ে।
আবু আইউব খালিদ (রা) আল্লাহর রাসূলের (সা) মেজবান হওয়ার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেন।

আবু আইউব (রা) একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন।
বদর থেকে শুরু করে প্রায় সব ক'টি যুদ্ধে তিনি আল্লাহর রাসূলের (সা) সংগী ছিলেন।
সীমাহীন সাহস নিয়ে তিনি লড়তেন।

বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ময়দানের ডাকে সাড়া দেন।
আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনু আফফানের (রা) শাসনকালে সিরিয়ার গভর্ণর মুয়াবিয়া (রা) পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যানটিনোপল অধিকার করার সংকল্প গ্রহণ করেন।
এই উদ্দেশ্যে তিনি গড়ে তোলেন একটি নৌ-বাহিনী।

অনেকগুলো জাহাজ তৈরি হয় অভিযানের জন্য।
ইয়াযিদ ইবনু মুয়াবিয়া (রা) নিযুক্ত হন নৌ-সেনাপতি।

আবু আইউব খালিদের (রা) বয়স তখন আশি বছর।
আল জিহাদের আহ্বানে তিনি সাড়া দেন।
বার্ধক্য তাঁকে এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।
যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন।
সাগরের ঢেউ ঠেলে সামনে এগুতে থাকে নৌ-যানগুলো।
পথিমধ্যে আবু আইউব (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন।
সেনাপতি তাঁকে দেখতে আসেন।
তাঁর খোঁজ খবর নেন।

আবু আইউব খালিদ (রা) ওয়াছিয়াত করেন, "সকল মুজাহিদদেরকে আমার সালাম পৌঁছাবে।
তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আবু আইউব তোমাদেরকে অনুরোধ করেছেন তোমরা দুর্বার গতিতে সামনে এগুবে এবং কনস্ট্যানটিনোপল জয় না করে থামবে না।
আমার মৃত্যু হলে আমার লাশ সাগরে ফেলে দেবে না।
লাশ সাথে নিয়ে যাবে এবং কনস্ট্যানটিনোপলের প্রাচীর ঘেঁষে দাফন করবে।"

সেই বার মুসলিম মুজাহিদরা কনস্ট্যানটিনোপল জয় করতে পারেননি।
তবে তাঁরা রোমান সেনাদেরকে ময়দান ছেড়ে দুর্গের ভেতর গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেন।
আর আবু আইউব খালিদ ইবনু যায়িদের (রা) অন্তিম বাসনা অনুযায়ী মুসলিম মুজাহিদরা রোমানদের রাজধানীর প্রতিরক্ষা প্রাচীর ঘেঁষে তাঁর লাশ দাফন করেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)।

২। ছাহাবীদের বিপ্লবী জীবন, ড. আবদুর রাহমান রা'ফাত পাশা।

৩। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ।

৪। বিশ্ব নবীর সাহাবী, তালিবুল হাশেমী।

৫। তারীখে ইসলাম, মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান (রহ)।

লেখক পরিচিতি

এ কে এম নাজির আহমদ ১৯৩৯ সনের জানুয়ারী মাসে কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত বরুড়া উপজিলার আড্ডা ইউনিয়নের বোয়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম উমার আলী ভূঁইয়া (মরহুম), আম্মার নাম গোলাপ জাহান (মরহুমা)। তিনি ১৯৫৭ সনে আড্ডা হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা পাস করেন। তিনি ১৯৫৯ সনে কুমিল্লা ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে আই.এ. পরীক্ষা পাশ করেন।

১৯৬২ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বি.এ. (অনার্স) এবং ১৯৬৩ সনে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এ. পরীক্ষা পাস করেন।

তিনি ১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৪-৬৫ কার্যকাল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি ছিলেন।

১৯৬৫ সনে অধ্যাপক হিসাবে লক্ষীপুর কলেজে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন।

১৯৬৬ সনের মধ্যভাগে তিনি অধ্যাপক হিসাবে কুমিল্লা ভিকটোরিয়া কলেজে যোগদান করেন। ঐ বছরই তিনি জামায়াতের রুকন হন।

বর্তমানে তিনি ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি মাসিক পৃথিবী (বাংলা) ও মাসিক আল-ইসলাম (ইংরেজী) পত্রিকার সম্পাদক।

'ইসলামী সংগঠন', 'আল্লাহর দিকে আহ্বান', 'ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি', আদর্শ মানব মুহাম্মদ(সা)', 'ইসলামের সোনালী যুগ', 'আল্লাহর পরিচয় ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস', ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ', 'যুগে যুগে ইসলামী জাগরণ', 'সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী', বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, উসমানী খিলাফতের ইতিকথা', 'ইসলামের দৃষ্টিতে পারস্পারিক অধিকার ও কর্তব্য'সহ তাঁর রচিত ও অনূদিত বইয়ের সংখ্যা ৩৭টি।

আহসান পাবলিকেশন